তখন তুমি করবে কী

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়



তখন তুমি করবে কী

তখন তুমি করবে কী

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ : ১ বৈশাখ ১৩৯৪

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য
অলংকরণ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ISBN 81-7066-075-0

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম
কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ১৫·০০

বাবা ও মা-কে

এই লেখকের অন্যান্য বই

লাবডুব (উপন্যাস)
রঙ বেরঙের গল্প
রোগটা যখন অসুখ

সূচী

তখন তুমি করবে কী

ধরো, বাবা-মার সঙ্গে তোমরা খেতে বসেছ। খুব হইচই হাসি গল্প করতে-করতে খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে হঠাৎ তোমার বোনের গলায় একটা মাছের কাঁটা ফুটে গেল। তোমার বোন নিশ্চয় তখন কান্নাকাটি শুরু করে দেবে। আর তার কান্না দেখে তোমার বাবা-মাও খুব ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। কী ঝঞ্ঝাট বলোতো ? বেশ খাওয়া-দাওয়া হচ্ছিল। হঠাৎ কী-এক উট্‌কো বিপদ এসে হাজির হল।

এখন কী করবে ? তোমাদের হইচই শুনে তখন দাদু, দিদা, কাজের মেয়ে সবাই এসে হাজির হবে। ওর কষ্ট দেখে প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু পরামর্শ দেবে। কেউ বলবে, শুক্‌নো মুড়ি কি ভাত খাইয়ে দাও। কেউবা চিঁড়ে চিবিয়ে গিলে খেতে বলবে। কেউ কলা খাওয়াতে বলবে। এমন কি, কেউ হয়ত গলার মধ্যে আঙুল চালিয়ে কাঁটাটাকে টেনে বার করে আনারও চেষ্টা করতে পারে।

এ-সবই কিন্তু খুব ভয়ের ব্যাপার। কারণ, কাঁটা ফুটলে সেটাকে বার করে আনা খুবই দরকার। চিঁড়ে-মুড়ি ইত্যাদি খাইয়ে কেউ-কেউ উপকার পেলেও পেতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ সময় ওই সব শুকনো খাবার খেয়ে অসুবিধা হয়। আর না হয় কাঁটাটা নেমে গিয়ে গলার নিচে অন্য কোথাও বা খাদ্যনালীতে আটকে যায়। আসলে, গলা থেকে কাঁটা বার করা ডাক্তারবাবুদের কাছে কোন সমস্যাই নয়। কারণ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, কাঁটাটা টনসিল অথবা জিভের গোড়ায় ফুটে থাকে। গলার মধ্যে

আলো ফেলে, জিভটাকে একটা চামচের মত যন্ত্র দিয়ে চেপে ধরে, একটা ফরসেপেস্-এর সাহায্যে এক মুহূর্তেই সেটাকে ডাক্তারবাবুরা বার করে নিয়ে আসতে পারেন।

তাই গলায় কাঁটা ফুটলে হাতুড়ে চিকিৎসায় না গিয়ে কাছাকাছি কোন হাসপাতালে বা গলার ডাক্তারের কাছেই যাওয়া উচিত। তাতে সময়ও বাঁচে, কষ্টও কম হয়। আর সত্যিই যদি কাঁটাটা নেমে গিয়ে দূরে অন্য কোথাও বিঁধে যায়, তখন কিন্তু সেটা আর অত সহজে নাও বেরতে পারে। এক-এক সময় তো রীতিমত অপরেশনেরও প্রয়োজন হয়!

এখন বুঝলে তো, গলায় কাঁটা ফোটা কত ঝামেলার ব্যাপার। তাই সব সময় খেয়াল রাখবে, যাতে কখনই গলায় কাঁটা না ফোটে। গলায় কেন কাঁটা ফোটে জানতো ? মাছ বেছে না খেলে, অন্যমনস্ক হয়ে খাওয়া-দাওয়া করলে, খেতে খেতে বেশি কথা বললে এবং খেতে বসে বেশি তাড়াহুড়ো করলে। তাই তোমাদের মধ্যে যারা খুব ছোট, খাওয়া-দাওয়ার সময় বড়রা মাছ বেছে দিতে চাইলে আপত্তি করবে না। আর যারা একটু বড় হয়েছো তারা মাছ কি মাংস খাওয়ার সময় ভুলবে না যে, কাঁটা বা হাড় ফুটে মহা বিপদ ঘটতে পারে।

মনে আছে নিশ্চয়, একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল ? সে কিন্তু বোকার মত চিঁড়ে-মুড়ি খেয়ে হাড়টাকে গলা থেকে নামাবার চেষ্টা করেনি। হাড়টাকে বার করার জন্য সে দৌড়ে গিয়েছিল বকের কাছে। কেন জানতো ? ডাক্তারবাবুরা যে ফরসেপস্ দিয়ে কাঁটা বার করেন সেটা ঠিক বকের ঠোঁটের মতই দেখতে !

একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কাঁটাটা যদি না বার করা হয় অথবা ডাক্তারবাবু যদি কাঁটাটা খুঁজে না পান তাহলে কী হবে ? অর্থাৎ গলায় কাঁটা নিয়ে একজন রোগী কতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে ? ছোট কাঁটা গলায় দুএকদিন থেকে গেলে রোগীর বিশেষ কোন ক্ষতি হওয়ার কথা নয়। বড় কাঁটা ফুটলে অবশ্য যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি রোগীকে চিকিৎসার আওতায় আনা উচিত। কিন্তু, ধরো, কোনো কারণে যদি তাকে ডাক্তারের কাছে আনা সম্ভব না হয় ? আমার এক্ষুণি একজন রোগীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তার পায়ের তলায় একটা কুলের কাঁটা ফুটে গিয়েছিল। তখন বর্ষাকাল। আর সে থাকত সুন্দরবন অঞ্চলের একটা গ্রামে। প্রতি

বর্ষাতেই জলেকাদায় তাদের পথঘাট বহুদিন ডুবে থাকে। তখন খুব প্রয়োজনেও তারা শহরে আসতে পারে না। তাদের জন্যে বলছি, গলায় কাঁটা ফুটলে গরম নুন জলে গলা ধুতে হয়। নরম-নরম খাবার খেতে হয় এবং ৫-৭ দিন নিয়মিত দু'বেলা পেনিসিলিন ইনজেকশন নিতে হয়। সঙ্গে দিনে দু'একবার ব্যথার ট্যাবলেটও খেতে পার। এই সামান্য চিকিৎসাতেই রোগীর বিপদ কেটে যেতে পারে। আর ওই সময়ের মধ্যে কাঁটা সরে গেলে রোগীর আর কোনও চিকিৎসারও প্রয়োজন থাকবে না। যারা শহরে বা কাছাকাছি কোথাও থাক তাদের বলছি, রাতবেরাতে হঠাৎ যদি এই রকম কোনও ঘটনা ঘটে যায়, তাহলে অহেতুক ভয় পেয়ে দৌড়াদৌড়ি করবে না। উপায় থাকলে তারা নিশ্চয় বেরিয়ে পড়বে। তা না হলে এক রাত অপেক্ষা করলেও এমনকিছু যাবে আসবে না। মনে রাখবে, ছোট কাঁটা দেরিতে বেরলেও চলতে পারে, কিন্তু বড় কাঁটা যত শীঘ্র সম্ভব বের করা উচিত। আর কাঁটা কখনই হারিয়ে যায় না। একস্‌রে বা অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে ডাক্তারবাবুরা ঠিক তাকে খুঁজে বার করতে পারেন।

অনেক সময় কষ্ট থাকলেও ডাক্তারবাবুরা বলেন, কাঁটা নেই। এ-কথায় কিন্তু কোন রোগীই সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে ভাবে কাঁটাটা নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কষ্ট যখন হচ্ছে, কাঁটাটা নিশ্চয় তাহলে কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে। আর সেটা খুঁজে না পাওয়া গেলে শরীরের অন্য কোন ক্ষতিও হতে পারে। এই সব নানা চিন্তায় সে তখন ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। ডাক্তারবাবুদের ভুল হতেই পারে। কিন্তু তোমাদেরও জেনে রাখা দরকার, কাঁটা অনেক সময় আপনা-আপনি পড়ে গেলেও গলার ব্যথা থেকে যেতে পারে। কারণ সেখানে একটা ঘা হয়। এই ব্যথা কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই সেরে যায়। তাই ভাল করে পরীক্ষা করে কাঁটা না পাওয়া গেলে ভয় পেতে নেই।

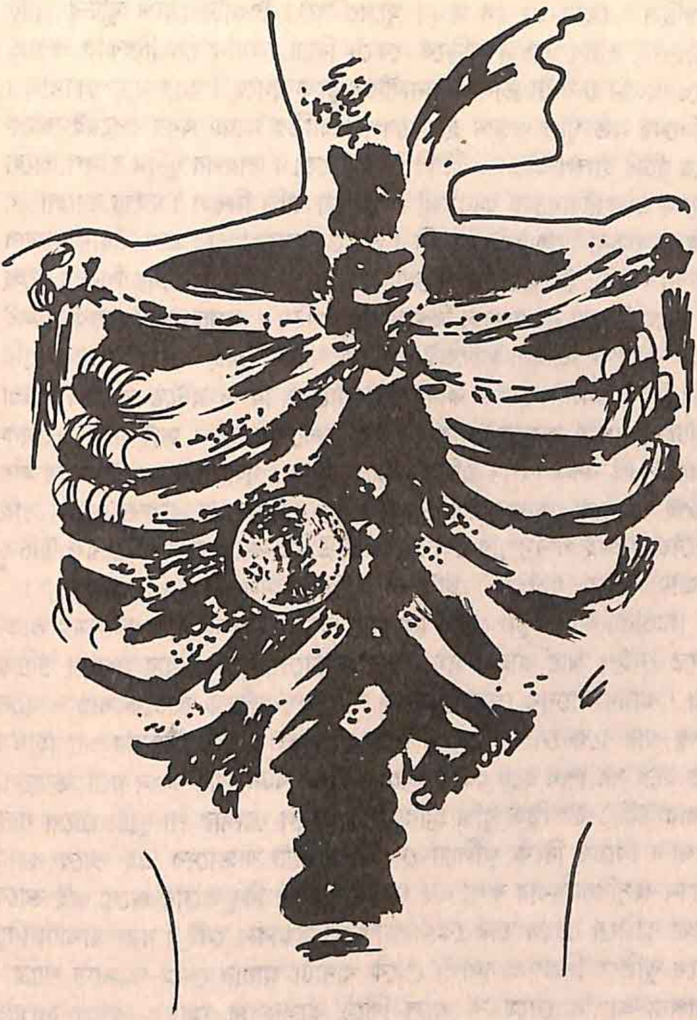
তোমরা নিশ্চয় ভাবছ শেষ পর্যন্ত সেই ছেলেটার কী হল। সেই, যার পায়ে কাঁটা ফুটেছিল। সে প্রায় এক মাস বাদে হাসপাতালে এসেছিল। তখন তার টিটেনাস হয়ে গেছে। কাঁটার চেয়ে টিটেনাস অনেক ভয়ের। এটা সে সহজেই এড়াতে পারত যদি তাকে সময় মত টিটেনাসের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হত। শুনলে অবাক হয়ে যাবে, পৃথিবীর বহু দেশ থেকে আজ টিটেনাস, ডিপথিরিয়া, হুপিংকাশি এবং পোলিওর মত

মারাত্মক রোগগুলো চির বিদায় নিয়েছে। কারণ সে-দেশের লোকেরা এই সব রোগের প্রতিষেধক টিকা নিতে কখনই ভোলে না। অথচ এ-সব রোগে আজও আমাদের দেশে অনেকে প্রাণ হারায়। জন্মের পরে মা-বাবারা যখন ছোট্ট-ছোট্ট ভাই-বোনেদের এই সব প্রতিষেধক ইনজেকশন দিতে নিয়ে যান, তখন তোমরা মনে-মনে কী ভীষণ রাগ কর। কিন্তু আসলে এ-সবই করা হয় ভালোর জন্যেই।

তোমাদের বেশির ভাগই নিশ্চয় এই সব প্রতিষেধক টিকা নিয়ে রেখেছ। তাই কারও কেটে-ছড়ে গেলে বা কাঁটা ফুটলে ভয়ের কোন কারণ নেই। খালি কাটাছড়ার সময় মনে করে টিটেনাসের আর একটা প্রতিষেধক ইনজেকশন নিতে ভুলবে না।

গলায় যদি সূঁচ আটকায়

মাংসের হাড় বা মাছের কাঁটা ছাড়াও গলা, শ্বাসনালী বা খাদ্যনালীতে আরও অনেক কিছুই আটকাতে পারে। যেমন টাকা, পয়সা, পেরেক, সূঁচ, পান-সুপুরি, আংটি, নকল দাঁত অথবা কাঁচের গুলি, লুডোর ছক্কা বা ঘুঁটি, পুতুলের হাত-পা, বেলুন ইত্যাদির মত টুকিটাকি খেলার জিনিস এবং আরও কত কী। আমাদের নানা রকমের বদ্ অভ্যাসের সুযোগে এরা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। যেমন মেয়েদের অনেকেই সেলাই করার ফাঁকে-ফাঁকে সুঁচটাকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে। পাঁচজনে বসে গল্পগাছা করছে, এই সময় হঠাৎ একজন পাশ থেকে কিছু হাসির কথা বলল। সবাই তার কথায় হোহো করে হেসে উঠল। জোরে হাসতে গেলেই প্রথমে বুকভরে প্রশ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন হয়। তাই যার দাঁতের মধ্যে সূঁচ ধরা আছে তাকে হাসিয়ে দিলে বিপদ ঘটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ এই অবস্থায় প্রশ্বাস নিতে গেলে হাওয়ার সঙ্গে সূঁচটাও শ্বাসনালীতে ঢুকে যেতে পারে। এইবার ভাবতো ওইভাবে দাঁত দিয়ে সূঁচ ধরা কী খারাপ অভ্যাস ! ছোট-ছোট বাচ্চারাও অনেক সময় পয়সা, কাঁচের গুলি বা অন্য



খাদ্যনালীতে টাকা।

কোন খেলার জিনিস মুখের মধ্যে রেখে এই রকম বিপদে পড়তে পারে। আমি একটা ছেলেকে জানি তার খাদ্যনালীতে একটা টাকা আটকে গিয়েছিল। (ছবি-১) সে তখন মুখের মধ্যে টাকাটা রেখে ঘুড়ির প্যাঁচ লড়ছিল। হঠাৎ একটা ঘুড়িকে কেটে দিয়ে যেমনি সে চিৎকার করতে গেছে অমনি টাকাটা তার খাদ্যনালীতে ঢুকে গেছে। আর যায় কোথায়। সেদিনের মত ঘুড়ি ওড়ান হয়ে গেল। বাড়ির বড়রা খবর পেয়েই তাকে নিয়ে ছুটল হাসপাতালে। কী বিপদ বল তো। তারপর দুদিন হাসপাতালে থেকে, ডাক্তারবাবুদের কানমলা খেয়ে সে বাড়ি ফিরল। ভাগ্য ভালো যে টাকাটা শ্বাসনালীতে আটকায় নি। তাহলে হয়তো তার প্রাণ বাঁচানই সম্ভব হত না। এইভাবে রোজ কত লোকই যে নানা বদ অভ্যাসের শিকার হচ্ছে তা নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ একটু সতর্ক হলেই এই সব বিপদ আমরা সহজেই এড়াতে পারি—তাই নয় কি ? পানসুপুরি মুখে দিয়ে বেশি বক-বক করলে বা ঘুমলেও বিপদ ঘটতে পারে। বড়রা ছোটদের চেয়ে অনেক বেশি জোরে কাশতে পারে। তাই তারা অনেক সময়েই এই রকম বিপদ এড়িয়ে যেতে পারে। গলায় কিছু আটকাবার মত হলেই তা তারা কেশে তুলে দেয়। কিন্তু ছোটদের সে শক্তিও নেই। তাই তাদের কখনই পানসুপুরি খেতে চাওয়া উচিত নয়। আর বড়দেরও উচিত হাজার বায়না ধরলেও ছোটদের হাতে পানসুপুরি না দেওয়া।

বাচ্চারা, যারা নতুন খেতে শিখেছে, তাদের কখনই খাওয়ার সময় তাড়া দিতে নেই। আর কান্নার সময় ভুলেও তাদের মুখে খাবার দেওয়া উচিত নয়। কারণ খাদ্যের ডেলা একবার যদি শ্বাসনালীতে আটকে যায় তাহলে কিন্তু আর রক্ষে নেই। ডাক্তার ডাকা বা হাসপাতালে পৌঁছবার আগেই দম বন্ধ হয়ে সব শেষ হয়ে যেতে পারে। এমন ঘটনা যদি কখন ঘটে, তাহলে, সবার উচিত উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে না ফেলে রোগীর পা দুটো চেপে ধরে মাথাটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া। ছোট বাচ্চাদের এই ভাবে ধরায় কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। আর সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে এই ভাবে মাথা ঝুলিয়ে ধরলে তার কোন ক্ষতিরও সম্ভাবনা নেই। বরং মাথাটা নিচু করে ঝুলিয়ে দিলে শ্বাসনালী থেকে খাদ্যটা আবার নেমে আসতে পারে। আপনা-আপনি নেমে না এলে পিঠে কয়েকবার জোরে-জোরে চাপড়ে দেওয়া দরকার। তাহলে ঠিকই নেমে আসবে আর রোগীরও প্রাণ বাঁচবে।

তোমরা হয়তো গলায় বা শ্বাসনালীতে নকল দাঁত আটকাবার কথাও শুনে থাকবে। নকল দাঁত পুরনো হলে আলগা হয়ে যেতে পারে। আর কারও দাঁত আলগা হয়ে গেলেই তার উচিত তক্ষুনি নতুন দাঁত গড়িয়ে আনা। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় আজ যাচ্ছি কাল যাচ্ছি করে তারা অকারণে দেরিও করেন। আলগা দাঁত মুখে নিয়ে হঠাৎ ধরো আলগোছা জল বা একটা ট্যাবলেট খাওয়ার দরকার পড়ল। আর ঠিক সেই সময়েই দাঁতটা খুলে গিয়ে খাদ্য বা শ্বাসনালীতে আটকে যেতে পারে। ছোটদের অবশ্য গলায় দাঁত আটকাবার ভয় নেই। কিন্তু তবুও তোমাদের ব্যাপারটা শিখিয়ে দিলাম। যাতে বাড়িতে বড়দের কারও নকল দাঁত আলগা হয়েছে শুনলেই তোমরা তাদের খুব তাগাদা দিয়ে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে পার।

খুব ছোট-ছোট বাচ্চাদের একটা অভ্যাস নিশ্চয় তোমরা লক্ষ্য করেছ। যারা সবে হামা দিতে বা হাঁটতে শিখেছে তারা হাতের কাছে কিছু পেলেই চেটে বা চিবিয়ে জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখতে চায়। এই সময়ে তারা কিন্তু ভাল করে খেতে বা গিলতেও শেখে না। তাই ওই সব বাচ্চারা বড়দের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে কখনও-কখনও দারুণ বিপদ ঘটিয়ে ফেলে। তাই ওদের গণ্ডির মধ্যে ছোটখাট এমন কিছুই রাখা উচিত নয় যা ওরা কুড়িয়ে নিয়ে মুখে দিতে পারে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ওই বয়সে মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে সব্জির ঝুড়ি থেকে কড়াইশুঁটি বা কুল চুরি করে মুখে দিয়ে দারুণ বিপদে পড়েছিলে। বিশ্বাস না হয় মাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে। একটা বড় চোর-ডাকাতের চেয়ে তোমাদের মত ক্ষুদে দুষ্টুকে চোখে-চোখে রাখাও অনেক শক্ত। আজ তোমরা বড় হয়ে হয়ত অনেক শান্তশিষ্ট হয়ে গেছ। কিন্তু একদিন ছিল যখন তোমাদের নিরাপদে বড় করে তুলতে তোমাদের বাবা মায়েদের কী দারুণ পরিশ্রম না করতে হয়েছিল। মাত্র কিছুদিন আগে আমাদের হাসপাতালে এই রকম একটা ছোট ছেলেকে আনা হয়েছিল। তার গলায় একটা জ্যান্ত কই মাছ আটকে গিয়েছিল। তখন অবশ্য সেই ছেলেটির জন্যে আমাদের কিছুই করার ছিল না। ঘটনাটা তার বাড়ির সবার কাছে শুনে আমাদের তখন সকলেরই চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। বাবা বাজার করে এনে থলেটা মেঝেতে রেখেছেন ; আর সে সবার অলক্ষ্যে হামা দিয়ে

এসে থলের ভেতরে হাত চালিয়ে একটা মাছ বার করে মুখে পুরে দিয়েছে।

গলায় মাছ আটকে যাওয়ার মত ঘটনা আসলে জেলেদের মধ্যেই খুব বেশি করে শোনা যায়। বিশেষ করে যারা অল্প জল-কাদার মধ্যে হাতে করে খুঁজে-খুঁজে সিঙ্গি বা কই জাতীয় মাছ ধরে। এদের মধ্যে অনেকেরই বদ অভ্যাস হল, একটা মাছ পেলে সেটা দাঁতের মধ্যে চেপে রেখে আর-একটা মাছের খোঁজ করা। জ্যান্ত মাছ এইভাবে মুখের মধ্যে চেপে রাখা খুবই বিপজ্জনক। একদিন-না-একদিন ফস্কে গিয়ে তারা শ্বাসনালী বা খাদ্যনালীতে ঢুকবেই। ঘরামিদের মধ্যে এই জাতীয় একটা খারাপ অভ্যাস লক্ষ করা যায়। যেমন-ধরো, দাঁতের মধ্যে পেরেক ধরে কাজ করা। পেটে কি বুকের মধ্যে পেরেক ঢুকিয়ে অনেক সময়েই এদের হাসপাতালে দৌড়তে হয়।

এইসব বিপদ কীভাবে এড়িয়ে চলা যেতে পারে আশা করি তাও তোমরা ভাল করেই বুঝতে পেরেছ। সুতরাং এখন থেকে সাবধান। খাবার-দাবার ছাড়া মুখে কখনই কিছু রাখবে না। যারা নতুন সেলাই করতে শিখছ মুখের মধ্যে ভুলেও সূঁচ নেবে না। খেতে বসে সতর্ক থাকবে, বকবক করবে না। বড়দের মত পান-সুপুরি খেতে চাইবে না। ঘুম চোখে খেতে বসবে না। মাছ-মাংস ভাল করে বেছে খাবে। খাওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবে না।

দাঁত নড়েছে

ছোটবেলায় দাঁত নড়লেই কী দারুণ ভয় লাগে তাই না ? মনে হয় মা-বাবা জানতে পারলেই এক্ষুনি বুঝি ডাক্তারবাবুর কাছে ধরে নিয়ে যাবে, আর ডাক্তারবাবু তখন একটা বিরাট সাঁড়াশি দিয়ে মড়মড় করে দাঁতটা তুলে দেন । ডাক্তারবাবুর ওই সাঁড়াশিটাকে কে না ভয় পায় বলো ! মুখ না ধুলে, দাঁতে নখ কাটলে, বেশি লজেন্স খেলে, পেনসিল অথবা পেন

চিবলে, কী অন্য কোন অন্যায় করলেই বড়রা ওই সাঁড়াশিটার কথা মনে করিয়ে দেন। আসলে কিন্তু ছোটদের দাঁত তুলতে একদমই লাগার কথা নয়। কারণ তোমাদের তো সবই দুধে-দাঁত। দুধে-দাঁতের কোন শেকড় থাকে না। তাই তারা সহজেই উঠে আসে। তাছাড়া ডাক্তারবাবুরাও দাঁত তোলার আগে খারাপ দাঁতটা ওষুধ দিয়ে অসাড় করে দেন।

জন্মের পর ৬ মাস বয়েস থেকে প্রথম যে ২০টা দাঁত গজায় সেগুলো সবই দুধে-দাঁত। ওই দাঁতগুলো বার তের বছর বয়সের মধ্যে সবই পড়ে যায়। তারপর যে ৩২টি দাঁত গজায় সেগুলো হচ্ছে স্থায়ী দাঁত। সেগুলো পড়ে গেলে কিন্তু আর কোন দিনই নতুন করে দাঁত গজাবে না।

দুধে-দাঁত যদিও পড়ে যাওয়াই নিয়ম তবুও দুধে-দাঁতকেও দারুণ যত্ন করতে হয়। যাতে সময়ের আগে তারা পড়ে না যায়! সময়ের আগে দুধে-দাঁত পড়ে গেলে কি হয় জানতো? স্থায়ী দাঁতেরা সঠিক পথ চিনে হাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। অর্থাৎ দুধে-দাঁতই স্থায়ী দাঁতকে পথ চিনিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসে। আর স্থায়ী দাঁত যদি পথ চিনতে না পারে তখন তারা মাড়ির উপর যে যেখানে পারে গজিয়ে ওঠে। ফলে দাঁত হয়ে যায় এলোমেলো। এইসব এলোমেলো দাঁতকে তখন ডাক্তারবাবুদের আবার সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে হয়। সে কিন্তু ভারি শক্ত ব্যাপার। অনেকের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নাও হতে পারে। তখন তাকে সারা জীবনই ওই রকম বিচ্ছিরি এবড়ো-খেবড়ো, উঁচুনীচু দাঁত নিয়ে কাটাতে হয়। এছাড়া এবড়ো-খেবড়ো দাঁত পরিষ্কার করাও খুব শক্ত। তাই কিছুদিনের মধ্যেই তাদের দাঁতের অসুখ হয়, মুখে গন্ধ হয় এবং শেষে একটা-একটা করে সব দাঁতগুলো পড়ে গিয়ে আরও বিশ্রী দেখতে হয়ে যায়। দুধে-দাঁত নড়তে দেখলেই বুঝবে এবার তার গোড়ায় স্থায়ী দাঁত এসে গেছে। তখন আর একদম দেরি না করে ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে দাঁতটা ফেলে আসবে। শুধু শুধু ভয় পেয়ে দাঁত তুলতে দেরি করবে না। এখন তোমার দাঁত তুলতে যেতে নিশ্চয় আর ভয় করবে না। কারণ তুমি জেনে গেছ যে দাঁত তুলতে একদমই লাগে না। তাছাড়া যদি দাঁত ফেলতে দেরি হয় তাহলে স্থায়ী দাঁত এলোমেলো হয়ে যেতে পারে।

কোন কোন বাড়িতে বড়রা শুকনো গামছা দিয়ে ধরে কি সুতো দিয়ে বেঁধে ছোটদের নড়া দাঁত ফেলার চেষ্টা করেন। এ কিন্তু ভারি খারাপ

অভ্যাস। কারণ এর ফলে অনেক সময়ই ছোটরা অহেতুক বিপদে পড়ে কষ্ট পায়। এইভাবে দাঁত তুললে রক্তপাতের সম্ভাবনা থাকে। আর নোংরা কাপড় বা তুলো দিয়ে রক্তপাত বন্ধের চেষ্টা করলে অনেক সময়ই ঘা পেকে যেতে পারে। এমন কি মারাত্মক টিটেনাস রোগও হতে পারে। এখন তো প্রায় সব হাসপাতালেই দাঁত তোলার ব্যবস্থা আছে। তাই দাঁত নড়লে সবার উচিত প্রথমেই হাসপাতালে যাওয়া। দুধে-দাঁত অসময়ে কেন পড়ে যায় জানতো ? ভাল করে দাঁত না মাজলে, সেফটিপিন, আলপিন বা মোটা কাঠি দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করার চেষ্টা করলে, অসাবধান হয়ে খেলাধুলো করতে গিয়ে দাঁতের উপর চোট পেলে, বেশি লজেন্স, চকলেট বা ওই জাতীয় কোন চিটে মিষ্টি খাবার খেলে। জোর করে মাংসের হাড় বা অন্য কোন শক্ত জিনিস চিবতে গেলেও অনেক সময় দাঁত ভেঙ্গে যেতে পারে। আমি একটা ছোট্ট ছেলেকে চিনি সে একদিন দাঁতে করে বোতলের ছিপি খুলতে গিয়ে চারটে দাঁত ভেঙে ফেলেছিল। এখনও তার স্থায়ী দাঁত গজাবার সময় হয়নি। তাই তাকে দেখলেই সবাই হাসে।

তোমরা অনেকেই কি করে দাঁত মাজতে হয় জানো না। দাঁত সবচেয়ে ভাল পরিষ্কার হয় টুথপেষ্ট আর ব্রাশ দিয়ে মাজলে। কিন্তু ব্রাশকে ঠিকভাবে ব্যবহার না করলে দাঁত পরিষ্কার নাও হতে পারে। ব্রাশকে দাঁতের গায়ে কখনই আড়াআড়িভাবে ঘষতে নেই। দাঁত ভালকরে পরিষ্কার করতে চাইলে ব্রাশকে দাঁতের গায়ে লম্বালম্বিভাবে চালাতে হয়। অর্থাৎ ব্রাশ চালাতে হবে দাঁতের গোড়া থেকে আগার দিকে। আর দাঁতের বাইরেটা ঘষে ছেড়ে দিলেই চলবে না। ভিতরের দিকটাও যত্ন করে পরিষ্কার করতে হবে। এইভাবে রোজ দিনে দুবার দাঁত পরিষ্কার করা উচিত। দাঁতের গোড়ায় কিছু আটকালে টুথপিক্ বা ডেণ্টাল ফ্লজ বলে এক রকমের শক্ত সুতো দিয়ে তা বার করা উচিত। লজেন্স, চকলেট বা ওই জাতীয় চিটচিটে মিষ্টি খাবার কখনই বেশি খাওয়া উচিত নয়। এইসব মিষ্টি খাবারই হচ্ছে ছোটদের দাঁতের সবচেয়ে বড় শত্রু। তাই কখন-কখন লোভ সামলাতে না পারলে দু একটা লজেন্স খেতে পার, কিন্তু ঠিক তার পরেই খুব ভাল করে মুখ ধুয়ে ফেলবে, যাতে দাঁতের গায়ে এইসব খাবার একদমই না জমে থাকতে পারে। যারা ওদের জমতে দেবে তাদের দাঁত ঠিক ক্ষয়ে গিয়ে কাল হয়ে যাবে। যাকে সবাই পোকা লাগা বলে।

ডাক্তারেরা বলেন ডেন্টাল কেরিস। তোমরা হয়তো গল্প শুনেছ যে রাস্তাঘাটে একজাতীয় লোক ঘুরে বেড়ায় যারা দাঁত থেকে সত্যিকারের পোকা বার করে দেখিয়ে দিতে পারে। দাঁতে পোকা লাগলে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। তাই ব্যথা-যন্ত্রণা দূর করার জন্যে অনেকেই ওই সব বুজরুকদের খপ্পরে পড়ে যায়। তোমরা যাতে বড় হয়ে ওই রকম ভুল না কর তাই দাঁতের পোকা-লাগা ব্যাপারটা ঠিক কি সেটা জেনে রাখা দরকার। মুখের মধ্যে এক প্রকারের জীবাণু থাকে। যার নাম ল্যাকটোব্যাসিলাস এসিডোফাইলাস। এইসব জীবাণু শর্করা জাতীয় চিট্‌চিটে খাবারের সঙ্গে মিলেমিশে মুখের মধ্যে ল্যাকটিক আর পাইরিউভিক অ্যাসিডের সৃষ্টি করে দাঁতের ক্ষয় ধরায়।

দাঁত মাজার জন্যে অনেকেই ছাই, নুন তেল, নিম দাঁতন বা ওই জাতীয় অনেক রকমের সস্তার জিনিস ব্যবহার করে। ওই সব জিনিস দাঁত পরিষ্কারের চেয়ে অপরিষ্কারই করে বেশি তাই কিছুদিনেই মধ্যেই তারা দাঁতের আর মাড়ির রোগে ভুগতে শুরু করে।

তোমরা হয়তো ভাবছো টুথ ব্রাশ কি পেষ্ট এর তো অনেক দাম। অনেকেরই তো এইসব ব্যবহার করার অবস্থা থাকে না। তাহলে তাদের দাঁতের কেন অসুখ করে না। সত্যিই পৃথিবীর সর্বত্র গরীবদের চেয়ে বড়লোকদেরই দাঁতের রোগ বেশি হয়। তার কারণ গরীবদের ঘরের বাচ্চারা যখন তখন লজেন্স, চকলেট, বিস্কুটের মত খাবার-দাবার খায় না। আর তারা নিয়মিত কিছু না কিছু শক্ত খাবার চিবিয়ে খায়। আমরা যত সভ্য হচ্ছি আমাদের দাঁতের রোগ ততই বাড়ছে। সভ্য মানুষ শক্ত খাবার-দাবার চিবিয়ে খাওয়ার কথা প্রায় ভুলতেই বসেছে। দাঁতকে মজবুত রাখতে হলে নিয়মিত শক্ত খাবার খাওয়া খুবই দরকার। এজন্যেই এস্কিমোদের কখনই দাঁতের রোগ হয় না। কারণ তারা জীবনেও শর্করা জাতীয় খাবার খায় না। খিদে পেলেই শক্ত কাঁচা মাংস চিবিয়ে খায়।

সুন্দর মজবুত দাঁতের আশায় তোমরা কিন্তু আরও একটা মজার ভুল করে বসো। তোমাদের মধ্যে অনেকেই দাঁত পড়লে সেটাকে খুঁজে-পেতে একটা ইঁদুরের গর্তে ফেলে দিয়ে মনে-মনে বলে আসে, ইঁদুর আমার এই দাঁতটা নিয়ে তোমার ভাল দাঁতটা দিও।

তোমরা নিশ্চয় ভাব, ইঁদুরের দাঁত ভারি মজবুত। কারণ তারা

দিনরাতেই দাঁতে করে কিছু-না-কিছু কাটে। অথচ কখনই তাদের দাঁত খারাপ হয় না। কিন্তু ইঁদুরদের কেন সারাদিন দাঁত চালাতে হয়, তা শুনলে তোমরা ভারি অবাক হয়ে যাবে।

ইঁদুরদের দাঁত খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে চায়। তাই সারাদিনই তারা কিছু-না-কিছুর ওপর ঘষে-ঘষে সেগুলোকে ছোট করে ফেলে। ইঁদুরেরা সারাদিন দাঁতে কাটার মত যদি কিছু না পেত তাহলে তাদের দাঁত বাড়তে বাড়তে একটা সমস্যার সৃষ্টি করত।

তাহলে এখন ভেবে বল তোমরা কি ইঁদুরের মত দাঁত চাও না সুস্থ মানুষের মত সুন্দর দাঁত চাও ?

যদি সুস্থ সুন্দর দাঁত চাও তাহলে নিশ্চয় রোজ দাঁতের যত্ন করবে। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা করতে ভুলো না। ভুলেও ভেবো না দাঁত তো অনেকগুলো। একটা খারাপ হলে এমন আর কী ক্ষতি হবে। মনে রাখবে দাঁতেদের মধ্যে দারুণ ভাব। একজন খারাপ হলেই তার দুঃখে আর একজন খারাপ হয়ে পড়ে। তাই দাঁতের কোন কষ্ট হলেই শুরুতেই চিকিৎসা করাবে। খারাপ দাঁতের লক্ষণ হচ্ছে—দাঁত সির-সির করা, ব্যথা হওয়া, ঠাণ্ডা কি গরম খাবার খেলে কনকন করা, পুঁজ-রক্ত পড়া, দাঁত নড়া এবং মুখে দুর্গন্ধ হওয়া। মনে থাকবে তো ?

চোখ করকর করছে

তেমাদের অনেকেরই বড়দের দেখাদেখি চশমা পরার ভীষণ লোভ হয়—তাইনা ? ভাব চশমা পরলে বুঝি কী দারুণই না দেখাবে। আর সেই লোভ মেটাতে তখন অনেকেই মিথ্যে-মিথ্যে বানিয়ে বলতে শুরু করো যে চোখে একদম দেখতে পারছ না।

অমন কথা শুনে মা-বাবা তো আর চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। তাই তখনই যেতে হয় কোন চোখের ডাক্তারের কাছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডাক্তারবাবুরা তার মনের কথাটা সহজেই বুঝে

ফেলেন। কিন্তু কেউ কেউ তোমরা এমন সব কষ্টের কথা বানিয়ে-বানিয়ে বল যে ডাক্তারবাবুদের চিন্তায় ফেলে দাও। তখন তাঁরা রোগীর ভালর জন্যেই কিছুদিনের জন্য একটা চশমা দিয়ে দেখতে চান কী ফল হয়।

এইভাবে মিথ্যে বলে চশমা হয়তো কেউ কখন পেয়েও যেতে পারে কিন্তু দুদিন বাদেই আর সে চশমা পরতে চায় না। অর্থাৎ কদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারে যে চোখে চশমা রাখাটা মোটেই আরামদায়ক ব্যাপার নয়। এই রকম মিথ্যে বলা দারুণ অন্যায়। জানতো মানুষের জীবনে দৃষ্টিহীনতার চেয়ে দুঃখজনক অবস্থা আর কিছুই নেই। তাই বোকার মত চোখের রোগী সেজে চশমা পরার শখ মেটানোর চেষ্টা না করে প্রথম থেকেই শিখে রাখা দরকার কি ভাবে আমরা সারা জীবন এই মূল্যবান চোখ দুটোকে ভাল রাখতে পারি। আচ্ছা বলতো কোন প্রাণী চোখের সবচেয়ে বড় শত্রু ? কোন খেলায় সবচেয়ে বেশি চোখ নষ্ট হয় ? বলে না দিলে উত্তরগুলো কিছুতেই মনে পড়বে না। এই প্রাণীটি হল শুঁয়োপোকা। আর খেলাটির নাম ডাংগুলি। এছাড়া ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা সাঁতার কাটাও চোখের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। বিশেষ করে শহরের গঙ্গায় আর গ্রামের পচা পুকুরে। হয়তো ভাবছো শুঁয়োপোকা আবার চোখে ঢুকবে কি করে ? পেয়ারা কি শিউলি ফুল চুরি করতে গিয়ে কিন্তু প্রায়ই চোখে শুঁয়োপোকা পড়ে।

চুরি করার সময় তো আর খেয়াল থাকে না কোথায় পাতার ফাঁকে শুঁয়োপোকা আছে। তুমি ওপরের দিকে তাকিয়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছ আর দাদাভাই গাছে উঠে ডাল নাড়া দিয়ে পেয়ারা কি ফুল ফেলছে। এই সময় তোমার চোখে একটা শুঁয়োপোকা পড়তে পারে। দেশগ্রামে যেখানে গাছপালা অনেক বেশি, সেখানে অবশ্য বাচ্চাদের জামাকাপড় কি বিছানামাদুরের মধ্যেও অনেক সময়ই শুঁয়োপোকা জড়িয়ে থাকে। তাই বাচ্চাদের শোয়াবার সময় কী জামাকাপড় পরাবার সময় বড়রা একটু খেয়াল না করলে এই জাতীয় বিপদ ঘটে যেতে পারে।

তাই বলছি কখন আর ওই রকম চুরির দলে থেকো না। ডাংগুলির সেই মারাত্মক ছুঁচলো কাঠের গুলিটার কথা ভাব তো, একবার ওটা চোখে গিঁথে গেলে কী সর্বনাশটাই না হতে পারে। আর কত রকমেরই তো খেলা আছে, ডাংগুলি না খেললে কী হয় না ?

গরমের সময় প্রায়ই দেখা যায় পুকুরে নেমে তোমরা আর কিছুতেই জল ছেড়ে উঠে আসতে চাও না। মা কী পিসিমণি পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে সমানেই ডেকে চলেছেন—উঠে আয় উঠে আয়। তারপর যখন সত্যিই উঠে এলে তখন দেখা গেল চোখ দুটো প্রায় রক্তজবার মত লাল হয়ে উঠেছে। রোজ-রোজ এরকম চোখ লাল হওয়া ভাল নয়। এর থেকে একদিন—এমন মরাত্মক ঘা হতে পারে যা চোখকে চিরতরে নষ্টই করে দিতে পারে।

তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ খেলতে-খেলতে রাগ হয়ে গেলে অন্যের চোখে ধুলো ছুঁড়ে দাও। এও কিন্তু ভারি অন্যায়। চোখে ধুলো বালি ঢুকেও অনেক খারাপ রোগের সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে আমাদের দেশে। যেখানে মানুষ আজও চিকিৎসার জন্য প্রথমেই ডাক্তারের কাছে না গিয়ে টোটকা ওষুধকেই বেশি শ্রেয় মনে করে। জানি তুমি হয়তো বলবে—ওসব জায়গাতেই তো-আর চোখের হাসপাতাল নেই। তারা কী করবে। চোখে কিছু ঢুকলে জোর করে চোখেরপাতা খুলে কাপড়ের খুঁট দিয়ে ঘষে-ঘষে সেটাকে বার করার চেষ্টা করাটা খুবই অন্যায়। যদি কাছাকাছি ডাক্তার না পাওয়া যায় তাহলে সবচেয়ে ভাল হল এক কাপ পরিষ্কার জলের মধ্যে সেই চোখটাকে ডুবিয়ে রেখে চোখের পাতাটাকে বারবার খোলা আর বন্ধ করা। এইভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধুলোবালি জলে ভেসে বেরিয়ে আসে। এর পরেও যদি না বেরয়, তাহলে চোখটাকে বেঁধে রেখে ডাক্তারবাবুর পরামর্শর জন্যে অপেক্ষা করা উচিত। ডাক্তারবাবুকে পেতে একটু দেরি হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু অহেতুক চোখটাকে রগড়ারগড়ি করা একদমই উচিত নয়।

কখনও-কখনও তোমাদের ছোট-ছোট ভাই বোনেরা পেন কী পেনসিল নেবার জন্যে দারুণ বায়না ধরে। ওদের নিজেদের হাতের ওপর এখনও তো তেমন দখল হয়নি। তাই ওদের হাতে পেন কী পেনসিল দিলে একটু পরেই ভুলিয়ে-ভালিয়ে কেড়ে নেবে। তা না হলে পেন কী পেনসিলের খোঁচায় নিজেরাই নিজেদের চোখ সাংঘাতিক রকমের জখম করতে পারে। ঠিক একই কারণে বাচ্চাদের হাতের নখ নিয়মিত কাটার কথা কখনই ভোলা উচিত নয়। কারণ নিজেদের চোখ নিজেরাই আঁচড়ে ফেলে মাঝে-মাঝেই ওরা ঘা-এর সৃষ্টি করে। মনে রাখবে বড়দের

ভুলে রোজ-রোজ কতশত বাচ্চার চোখ চিরতরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ছোট বাচ্চাদের হাতের কাছে এমন কিছু রাখতে নেই যা ওদের চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। ঝাঁটারকাঠি, চুন, ফিনাইলের মত মারাত্মক কিছু চোখে লাগিয়ে ফেলে ওরা প্রায়ই দারুণ বিপদে পড়ে। মায়েরা অনেক সময়ই বাচ্চাদের কোলে নিয়ে রান্না করেন সেটাও কিন্তু অনেক মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। গরম তেল ছিটকে রোজ কত বাচ্চার চোখ যে জখম হচ্ছে তা-আর না বলাই ভাল।

অনেক বাচ্চাকে অনর্গল চোখ পিটপিট করতে দেখা যায়। তাকে যে দ্যাখে সেই খুব অবাক হয় বা রাগ করে। এটা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা মুদ্রাদোষ। থেকে থেকে হাঁ করা বা কাঁধ নাচানর মতই বদঅভ্যাস। ডাক্তারবাবুরা দেখে যদি বলে দেন যে ব্যাপারটা কোন রোগের কারণে নয়, তাহলে কিন্তু একটু কড়া শাসন করলেই রোগটা সেরে যেতে পারে। তোমরা এখনও যারা চোখ পিটপিট করছ এবার তারা সাবধান হও। কারণ এর পরে মা-বাবার কাছে বকুনি খেলে আমায় কিন্তু দোষ দিতে পারবে না।

এবার তোমাদের আর-এক-রকম-রোগের কথা বলব যেটা খুবই মারাত্মক। যদি কোন বাচ্চা কিছুতেই চোখ খুলতে না চায়, তাহলে সবার উচিত তাকে তক্ষুনি ডাক্তার দেখান। 'এ' ভিটামিনের অভাবে চোখে ঘা হলে এই রকম হতে পারে। চিকিৎসায় দেরি হলে এই রোগ চোখকে শেষ করে দিতে পারে। কিন্তু সময়ে চিকিৎসা পেলে এ রোগ সম্পূর্ণই সেরে যায়। হয়তো তোমরা অনেকেই জান না যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন নগণ্য রোগ বা দুর্ঘটনাকে অবহেলা করার জন্যই মানুষ দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে। জন্মান্ধের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এত সব জেনেও কিন্তু আসল সময়ে আমরা ঠিকই ভুল করে ফেলি। কারও চোখে কিছু হয়েছে শুনলেই গোলাপ জল কি পদ্মমধু লাগাতে বলি। গ্রামদেশে হাতিশুঁড়ের রস আর গেঁড়ি-গুগলির জল তো আজও প্রচলিত। যাই-হোক তোমরা তো শিখলে কি ভাবে চোখের যত্ন নিতে হয় আর চোখের যে কোন অসুখে কেন তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করান উচিত।

মনে রাখবে দৃষ্টিহীনতার চেয়ে দুঃখের আর কিছুই হতে পারে না। তাই চোখের অল্প অসুখ করলেই সাবধান হবে। পড়তে বসে ঠিক দেখতে না

পাওয়া, স্কুলে বোর্ডের লেখা পড়তে কষ্ট হওয়া, মাথা ব্যথা করা, রাতে কম দেখা, চোখ করকর করা, পিচুটি পড়া, জল পড়া, মাঝে মাঝে ট্যারা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি মোটেই ভাল কথা নয়। এই রকমের কোন কষ্ট হলেই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

নাকের মধ্যে কিছু ঢুকেছে

তোমরা ছোটরা কত রকমের দুষ্টুমিই তো কর। কিন্তু তারই মধ্যে কিছু কিছু দুষ্টুমি আছে যা খুবই বিপদের হতে পারে। এবার তোমাদের সেই রকমই এক দুষ্টুমির কথা বলব। কী, বুঝতে পারছ না তো ? তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ নাকের মধ্যে এটা ওটা ঢুকিয়ে বস। ঠিক না ? যেমন ধর পুঁথি, রবার, পেনসিলের টুকরো, কড়াইশুঁটি, চকলেটের কাগজ—আরও কত কী। কিন্তু জান কী, এই রকমের দুষ্টুমি কী দারুণ বিপদ ডেকে আনতে পারে ? নিশ্চয় জান না। আর তা যদি জানতে, তাহলে এই রকম কোন অন্যায় করলে সঙ্গে সঙ্গেই মা কী বাবাকে গিয়ে বলতে। কিন্তু না—তোমরা তা কখনও অন্য কাউকে জানতে দাও না। কেন জান তো—ভয়ে। জানতে পারলে যদি বড়রা ধরে মারে। ফলে বাড়িতে কেউই জানতে পারে না। আর এজন্যেই ব্যাপারটা ক্রমশই জটিল হয়ে যায়। কারণ শরীরের মধ্যে কিছু ঢুকলে, তাকে যদি সময়ে বার করে না দেওয়া হয়, তাহলে সে-তো আর বেশি দিন বিনা কষ্টে থাকতে পারে না ; কদিনের মধ্যেই কিছু-না-কিছু কষ্ট হবেই। কারও নাক দিয়ে রক্ত পড়বে। কারও নাকে দুর্গন্ধ হবে, সর্দি বেরবে। রক্ত কী সর্দি বেরলে ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে যায়। কিন্তু শুধু যদি দুর্গন্ধ বেরয়, তখনই হয় ভারি মুশকিল। তখন কেউ সন্দেহই করতে পারে না যে দুর্গন্ধের কারণ লুকিয়ে আছে তোমাদেরই কার ছোট্ট একটা নাকের মধ্যে। শেষে মা কিন্তু একদিন ঠিকই ব্যাপারটা বুঝে ফেলেন। কারণ মায়ের কাছে শুতে গেলেই তিনি আবার সেই গন্ধটা পান ! তখন তো আর ঘরে কেউ নেই। খালি তুমি

আর মা। তাই মা বুঝে ফেলেন যে এ গন্ধ নিশ্চয়ই তোমারই শরীর থেকে বেরচ্ছে। কিন্তু সব মা-ই প্রথমে ভাবেন বোধহয় ভাল করে মুখ ধোওনি, তাই এত গন্ধ। কিন্তু বার-বার মুখ ধুইয়েও যখন গন্ধটা কিছুতেই কমান যায় না তখন তাঁর মনে সন্দেহ জাগে গন্ধটা নাক থেকে বেরচ্ছে না তো ? কে জানে হয়তো সর্দির গন্ধ। আর ঠিক তখনই সে ধরা পড়ে যায়। কারণ এবার তাকে সর্দির চিকিৎসার জন্য কোন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আর সেখানে ডাক্তারবাবু নাকটা পরীক্ষা করেই দেখতে পান ভিতরে কী যেন একটা ঢুকে আছে। আর তারপরই ঘটে সেই লজ্জার ব্যাপারটা। সবার সামনে ডাক্তারবাবু নাক থেকে একটা সেন্ট রবার কী লজেন্সের কাগজ টেনে বার করেন। সত্যি কী লজ্জা বলতো ? হাসপাতালে এক-ঘর লোকের সামনে তুমি ধরা পড়ে গেলে। আর মা-বাবাই কী তখন তোমায় আদর করবে ভাবছ। তাঁরাও বকবেন!হ্যাঁ, সবার সামনেই। তখন সবাই জেনে যাবে যে তুমি এক নম্বরের দুষ্টু।

কিন্তু বাচ্চারা তো আর স্কুল যায় না। তাই তারা তোমাদের মত লজেন্স-পেনসিল কী রবার কিছুই হাতে পায় না। তারাও কিন্তু মাঝে-মাঝে এই রকম অঘটন ঘটিয়ে বসে। সেটা অবশ্য দুষ্টুমি করে নয়। হামা দিতে-দিতে হাতের কাছে একটা-কিছু পেয়ে গেল, ধরো কড়াইশুঁটি কী তেঁতুল-দানা। এমনি টপ করে সেটা নাকের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল। কেউ দেখে ফেললে ভাল। তা নাহলে আবার সেই ঝঞ্ঝাট। যতক্ষণ না রক্ত বেরচ্ছে কী গন্ধ হচ্ছে, ততক্ষণ কেউ জানতেই পারবে না ওর নাকের মধ্যে কী আছে।

এই সব ঘটনা দেখে বড়রাও কিন্তু মাঝে-মাঝে দারুণ ভুল করে বসেন। হঠাৎ যদি কেউ দেখে ফেলেন বা জানতে পারেন যে কোন বাচ্চা নাকের মধ্যে কিছু ঢুকিয়েছেন, অমনি তাঁরা চেষ্টা করেন সেটাকে বার করে আনতে।

কেউ নাকে নস্যি গুঁজে দেন, কেউ বা চেষ্টা করেন মাথার কাঁটা কী সন্না দিয়ে সেটা টেনে বার করতে। এ কিন্তু ভারি অন্যায়। কারণ নাক থেকে কিছু বার করা তো অত সহজ নয়। সে দায়িত্ব শুধু নাকের ডাক্তাররাই নিতে পারেন। আর কারও চেষ্টাই করা উচিত নয়। কেন জান ? বাচ্চারা নাকে কিছু ঢোকালে সাধারণতই সেটা বেশি দূরে যেতে পারে না। নাকের

ভেতরে হাতের কাছেই কোথাও আটকে থাকে। সেখান থেকে সেটাকে বার করে আনা কোন একজন নাকের ডাক্তারের পক্ষে মোটেই শক্ত নয়। কিন্তু নাকে নস্যি দিয়ে হাঁচাতে গেলে সেটা অধিকাংশ সময়ই প্রশ্বাসের টানে নাকের অনেক ভেতরে কোথাও ঢুকে যায়। আর তখন কিন্তু সেটাকে আগের মত অত সহজে বার করে আনা যাবে না। সেটাকে বার করে আনতে তখন হয়তো অপারেশনও করতে হতে পারে। তার নাকের মধ্যে সন্না কী চুলের কাঁটা ঢোকান তো আরও মারাত্মক। কারণ এ সবের খোঁচায় নাক থেকে রক্তও বেরতে পারে। তাই বলব, এই রকম কোন বিপদ হলে আনাড়ির মত সেটাকে বার করার চেষ্টা না করে সোজা কোন নাকের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়াই ভাল। এতে যদি অপেক্ষা করতে হয় তো সেও ভাল। কারণ নাকে কিছু ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গেই তো আর রোগীর কিছু বিপদ ঘটে যাচ্ছে না। সবার মনে রাখা উচিত এ ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করলেই বিপদ এসে যেতে পারে। বড়দের ভুলের শিকার হয়ে প্রায়ই কত যে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের হাসপাতালে আসতে হয়—তা তোমরা নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না।

আচ্ছা তোমরা নাকের মধ্যে জোঁক ঢুকে যাওয়ার কথা শুনেছ কি? গ্রামদেশে প্রায়ই এই রকম বিপদের কথা শোনা যায়। বিশেষ করে বর্ষাকালে। যখন জলে খুব জোঁক হয়। পুকুর কী নদীর জলে স্নান করতে গিয়ে ডুব দিলে আর হঠাৎ ধর সেই সময় তোমার নাকের মধ্যে একটা জোঁক ঢুকে পড়ল। জোঁক একবার নাকের মধ্যে ঢুকতে পারলে সে কিন্তু আর কিছুতেই বেরতে চায় না। নাকের মধ্যে কামড়ে ধরে বসে থাকে। ফলে একটু পরেই শুরু হয় নাক দিয়ে রক্ত-পড়া। আর যতক্ষণ না ওই জোঁকটাকে বার করা যাচ্ছে ততক্ষণ ওই রক্ত-পড়া চলবে। কী বিপদ বলতো। এইসব বিপদ এড়াতে হলে বর্ষাকালে জমা জলে কী ছোট পুকুরে কখনই বেশি ডুব দিয়ে চান করা উচিত নয়। আর পুকুর কী নদীতে স্নানের পর নাক দিয়ে যদি রক্ত বেরয় তাহলে তক্ষুনি নাকটা একবার পরীক্ষা করে নেওয়া ভাল। রক্ত পড়ার কারণ যদি জোঁক হয় তাহলে কিন্তু সেটাকে বের না করে অন্য কোন চিকিৎসাতেই ওই রক্ত বন্ধ করা সম্ভব নয়।

এমন অনেক জিনিস আছে যারা কোন কষ্ট না দিয়ে দীর্ঘকাল নাকের মধ্যে জমা থাকতে পারে। যেমন ধর প্লাস্টিকের টুকরো, সুতো, টিপ,

বোতাম। এই রকম কোন-কিছু জিনিস যদি বেশিদিন নাকের মধ্যে থেকে যায় তাহলে শরীরের ক্যালসিয়াম অথবা ম্যাগনেসিয়াম কারবনেট কী ফসফেট তার চারদিকে জমা হতে হতে শেষে নাকের মধ্যে একটা পাথরের সৃষ্টি করতে পারে। এ রকম তো অনেক সময়েই শোনা যায় যে কারও নাকের মধ্যে থেকে একটা বিরাট পাথর পাওয়া গেছে। এতে কিন্তু এমন কিছু আশ্চর্য হবার নেই। কারণ এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে। তোমরা যারা বড় হয়ে ডাক্তার হবে তারা এ রকম অনেক পাথরই দেখতে পাবে।

আমার এখন ভাবতে খুব ভাল লাগছে যে অন্তত তোমাদের নাক থেকে আর কখনই ওইসব পাথর-টাথর পাওয়া যাবে না। আর তোমাদের মধ্যে কেউ কখনই নাকের মধ্যে কিছু ঢুকিয়ে ফেলে ওইসব বিপদ-আপদের শিকার হবে না। কারণ আর নিশ্চয়ই কখনই তোমরা কেউ দুষ্টুমি করে নাকের মধ্যে কিছু পুরবে না।

নাকের কাজ কি জানতো ? শ্বাস নেওয়া আর গন্ধ পেতে সাহায্য করা। দুটোই আমাদের দারুণ প্রয়োজনীয়। যারা নাকের কোন রোগের কারণে ভাল করে শ্বাস নিতে পারে না, তারা অল্পেই হাঁপিয়ে পড়ে। একদম খেলাধুলো করতে পারে না। রাত্রে ঘুমতে কষ্ট পায়। শেষে দিন-রাত মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে-নিতে তাদের গলায় কী ফুসফুসে নানা রকমের অসুখ করে যায়।

গন্ধ না পাওয়াও কিন্তু ভারি মুশকিলের। সেকি শুধু ফুলের কী সেন্টের গন্ধ পাবে না বলে ? মোটেই না। জানতো, আমাদের খেতে ভাল লাগে কারণ আমরা খাবারের গন্ধ পাই। যে খাবারের যত ভাল গন্ধ সেই খাবার খেতে আমরা তত বেশি ভালবাসি। জিভে জল এসে পড়ে—তাই না ? সেই প্রবাদ বাক্যটা জানতো—'ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনং' ! তাই কেউ যদি ঘ্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে তাহলে তার খাবারের স্বাদ পাওয়ার ক্ষমতাও হারিয়ে যায়। সে তখন বুঝতে পারে না যে, সে মাংস খাচ্ছে না সুক্ত খাচ্ছে। কী দুঃখের কথা ভাবতো ? এই ঘ্রাণশক্তি একবার খারাপ হয়ে গেলে আর কিছুতেই ভাল হতে চায় না। আর তখন তাকে সারাজীবন খাওয়ার আনন্দ ভুলে থাকতে হয়।

শ্বাস -নেওয়া আর ঘ্রাণ-নেওয়া ছাড়াও নাকের আরও একটা কাজ আছে। জান তো—নাকের সঙ্গে গলার স্বরের একটা সম্পর্ক আছে।

নাকটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরে কথা বলার চেষ্টা কর, দেখবে নিজের গলার স্বর নিজেই চিনতে পারবে না। তখন 'ন' কে বলছ 'ল'। আবার এমন অসুখ আছে যখন নাকের ভিতর দিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হাওয়া বেরিয়ে যায়। আর তখন গলার আওয়াজটা হয়ে যায় খনা—ঠিক শাঁকচুন্নির মতন। তখন আয় বলতে গিয়ে বলবে—আঁয়, আমি বলতে গেলে—বলবে—আঁমিঁ।

এখন বুঝলে তো কেন নাকের যত্ন নেওয়া উচিত, নাকের অসুখ করলে কেন তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার।

নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে !

তোমরা কী জয়কে চেন ? কৃষ্ণকলি মাসির ছেলে জয়। একদিন সকালে ওর মা স্কুলের ব্যাগ খুলেই তো অবাক। এ আবার কী ? স্কুল থেকে চিঠি পাঠিয়েছে মনে হচ্ছে। চিঠিটা হাতে নিয়েই তিনি জয়কে ভীষণ বকুনি দিলেন। মিস্ চিঠি দিলে যে দেখাতে হয় তাও জান না। তারপর চিঠি পড়েই তো ওর মা আর বাবা অবাক। ওমা ! সে কী কথা ! কাল নাকি জয়ের নাক থেকে রক্ত পড়েছিল ? কই জয় তো কিছু বলেনি। ভাগ্যিস মিস্ লিখে পাঠিয়েছেন। তা না হলে তো জানাই যেত না।

তোমরা নিশ্চয় ভাবছ জয় বোধ হয় নাকে পুঁথি বা অন্য কিছু ঢুকিয়েছে। কিন্তু না। পুঁথি কী জোঁক ঢুকলে নাক থেকে রক্ত পড়ে বটে, তবে তার চেয়েও অনেক সাধারণ কারণ আছে যার জন্য বাচ্চাদের নাক থেকে প্রায়ই রক্ত পড়তে পারে।

যাই হোক সেদিন তো আর জয়ের স্কুল যাওয়া হল না। ওর মা-বাবা তক্ষুনি ওকে ওদের ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে গেলেন।

ডাক্তারবাবু সব শুনেটুনে শেষে যন্ত্রপাতি দিয়ে জয়ের নাকটা পরীক্ষা করেই চেঁচিয়ে উঠলেন। আরে দুষ্টু ছেলে তুমি এ কী করেছ। দেখি দেখি তোমার হাতটা দেখি। এই বলে ডাক্তারবাবু জয়ের ডান হাতটা টেনে নিয়ে

ওর আঙুলগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন।

জয়ের মা বাবা তো এই সব দেখে শুনে একদম অবাক। এ আবার কী। এলাম দেখাতে নাক। আর ডাক্তারবাবু কিনা ওর আঙুল পরীক্ষা করছেন। কিন্তু না, একটু পরেই ডাক্তারবাবু ব্যাপারটা বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। উনি দেখিয়ে দিলেন যে, জয়ের হাতের নখগুলো খুবই বেড়ে উঠেছে। তাই ও এখন নাক পরিষ্কার করার চেষ্টা করলেই নাকে ঘা হচ্ছে আর রক্ত পড়ছে।

সব শুনেটুনে জয়ের মায়ের তো দারুণ মন খারাপ হয়ে গেল। মনে-মনে জয়ের ওপর রাগও করলেন। কারণ আজকাল নখ কাটাতে গেলেই ভয়ে দুষ্টুমি করে পালিয়ে যায়।

ইস্, কী কাণ্ড বলতো। কোথায় হাতের নখ আর কোথায় নাকের ঘা। তোমরা এখন প্রশ্ন তুলতে পার যে, আঙুল দিয়ে তো আমরা চোখ কানও পরিষ্কার করি। গা মাথাও তো চুলকাই। ওইসব জায়গা দিয়ে তো কই রক্ত পড়ে না।

নাক থেকে যে রক্ত পড়ে তার অবশ্যই একটা বিশেষ কারণ আছে। কিন্তু তা বলে ভেব না যে, ওইসব জায়গায় নখের আঁচড়ে কিছু হয় না। চোখে কী কানেও ঘা হয়। মাথাও আঁচড়ে যায়। তোমরা কী এঁটো পেত্নীর গল্প শোন নি ? হাত না ধুয়ে এঁটো নিয়ে ঘুমুলে রাতে এঁটো-পেত্নী আঁচড়ে দেয়। কারও কারও এখন নিশ্চয় মনে পড়ছে—তাই না ? সকালে উঠে দেখলে গায়ে কী পায়ে আঁচড়ের দাগ। আসলে ব্যাপারটা কী হয় বলছি। গায়ে এঁটো লেগে থাকলে তা শুকিয়ে গিয়ে ভীষণ সড়-সড় করে। আর তখন খুব চুলকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু হাতে যদি নখ থাকে তাহলে আর রক্ষে নেই। ঘুমের ঘোরে নিজের গা নিজেই তখন আঁচড়ে ফেলবে।

এখন বুঝলে তো হাতের নখ থেকে কত রকমের বিপদ হতে পারে। এর মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক হল নাক দিয়ে রক্ত পড়া। কারণ নাকে বেশ কয়েকটা বড়-বড় ধমনি থাকে। তাই নাকে ঘা হলেই প্রচুর রক্তপাত হয়। বড়দের শরীরে ছোটদের তুলনায় অনেক বেশী রক্ত থাকে। তাই তাদের হঠাৎ অনেক রক্তপাত হওয়া যত না বিপদের, তার চেয়ে ছোটদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি। ছোটরা কখনই বেশি রক্ত পড়লে সহ্য করতে পারে না। তোমরা আবার প্রশ্ন তুলতে পার, হাতের নখ কী সোজা সেই

ধমনিগুলোকেই আঁচড়ে দেয় । হ্যাঁ, সত্যিই তাই । তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে, নাকের মধ্যে যদি একটা আঙুল পোরা যায় তাহলে আঙুলের ডগাটা নাকের যে অংশটাকে স্পর্শ করে সেখানে নাকের প্রায় সব কটি ধমনি মিলিত হয়ে একটা জালিকার সৃষ্টি করে । তাই সেই জায়গায় কোন আঁচড় বা আঘাত লাগলে যে প্রচুর রক্তপাত হবে সে তো জানা কথা । নাকের এই বিশেষ স্থানটির বৈশিষ্ট্যের কথা প্রথম আবিষ্কার করেন আমেরিকার ডাঃ জেমস লিটিল । তাই নাকের মধ্যে ওই বিশেষ জায়গাটিকে 'লিটিলস এরিয়া' বলা হয় ।

এছাড়াও আরও একটা খুবই সাধারণ কারণে নাক থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়ে যেতে পারে । সেটা হচ্ছে—নাকে চোট-পাওয়া । তোমাদের মধ্যে যারা খুব দুরন্ত তারা তো দিনের মধ্যে দশবারই পড়ছ আর শরীরে আঘাত পাচ্ছ । শুনলে অবাক হবে যে, পড়েটড়ে গেলে শরীরের অন্য জায়গার তুলনায় নাকে খুব কমই আঘাত লাগে । মারামারি, ঘুষোঘুষি করার সময় কিন্তু প্রথমেই লক্ষ্য থাকে নাকের ওপর । জেতবার জন্যে তখন সবাই চেষ্টা করে কী করে ঠিক নাকের ওপর একটা ঘুষি মারা যায় । কী লজ্জার কথা বলতো । একজন মানুষ চেষ্টা করে, কী ভাবে তারই মত আর একটা মানুষকে বেশি কাহিল করা যায় । ভাবতো, রেগে গেলে মানুষ কী অমানুষ হয়ে যায় । তাই কখনও কোন কারেণই মাথা গরম করতে নেই ।

জানতো নাকের রক্ত বন্ধ করার একটা খুব সহজ উপায় আছে । আর সেটা তোমাদের সকলেরই শিখে রাখা উচিৎ । ধর কোথাও পিকনিক গেছ, কী ক্যাম্পে গেছ । আর সেখানে তোমাদেরই একজন বন্ধুর নাক থেকে দারুণ রক্ত পড়তে লাগল । সেখানে না আছে কাছাকাছি কোন ডাক্তার কী হাসপাতাল । হয়তো বুদ্ধি-পরামর্শ দেবার জন্যে বড়রাও কেউ কাছাকাছি নেই । তখন তুমি কী করবে । কী, বরফ দেওয়ার কথা ভাবছ তো । বরফ দিয়ে উপকার পাওয়া যেতে পারে ঠিকই, কিন্তু বরফ-ই কী তাই সব সময় মজুত থাকে । তাহলে শিখে নাও । দুটো আঙুল দিয়ে তার নাকটা বেশ শক্ত করে টিপে ধরবে । আর দশ-কুড়ি মিনিটের আগে কিছুতেই ছাড়বে না । হয়তো ভাবছ তাহলে সে শ্বাস নেবে কী ভাবে । কেন, মুখ দিয়ে !! মনে রাখবে যত বেশিক্ষণ নাকটা টিপে ধরে রাখা যাবে ততই তার

উপকার হবে।

এবার মনে থাকবে তো ? হাতে নখ রাখবে না। অযথা নাক খুঁটবে না। কারও নাকের ওপর আঘাত করবে না। অহেতুক লাফালাফি করবে না। আর কারও নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে দেখলেই নাকটা টিপে ধরবে—কেমন শেখালাম। মনে রাখবে নাকে ঘা হয়েছে মনে হলে সালফার কী নিওমাইসিনের মত মলম লাগাবে। কারণ অধিকাংশ ঘা-ই এ-জাতীয় কোন ওষুধে সেরে যাবে।

নাক বেঁকে গেছে !

নিশ্চয় মনে আছে, আমি তোমাদের একটু শিখিয়েছিলাম যে, কখন কারও নাকের ওপর আঘাত করতে নেই। কারণ মুখের সৌন্দর্য হচ্ছে নাক, আর সেই নাক বেঁকে গেলে মুখটা বিশ্রী দেখতে হয়ে যায়। খেলাধুলোর সময়ও কিন্তু এই কথাটা মনে রাখা উচিত। কারণ মুখের মধ্যে যেহেতু নাকটাই হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু, তাই সব রকম বড় খেলাতে নাকটাই প্রথম চোট পায়। যারা বক্সিং লড়ে তাদের নাক তো শেষ পর্যন্ত যা-তা হয়ে যায়। জীবনে বড় বক্সার হতে হলে মুখের সৌন্দর্যের কথা ভাবলে চলবে না। তাই বক্সাররা কখনই নাক সোজা কী বেঁকা রইল এ নিয়ে মোটে মাথা ঘামায় না। কিন্তু তা বলে তো আর সবাই নাকের কথা ভুলে থাকতে পারে না। নাকের জন্যে মুখটা বিশ্রী লাগুক, এ নিশ্চয় কেউই চাইবে না। অথচ নাক বেঁকে যেতে পারে ভেবে জীবনে খেলাধুলো করতে যাব না—এ কথাও নিশ্চয় ভাবা যায় না। তার চেয়ে বরং শিখে রাখা ভাল নাক বেঁকে গেলে কী করা উচিত।

আঘাত পেয়ে নাক বেঁকলেই বুঝতে হবে নিশ্চয় নাকের হাড় ভেঙে গেছে। ভেঙে গিয়ে যেমন নাকের বাইরের হাড় বেঁকে যায়, তেমনি ভিতরের হাড়ও বেঁকে যেতে পারে। নাকে চোট লাগার পর যদি নিঃশ্বাস এর অসুবিধা হয় অর্থাৎ নাক যদি বন্ধ-বন্ধ মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে

যে নাকের ভিতরের হাড় বেঁকে গেছে। নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে না পারলে বেশ কষ্ট হয়। তখন দিনরাত মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হবে। গলা শুকিয়ে যাবে, যখন-তখন কাশি হবে, বুকে সর্দি বসবে। খেতে, শুতে, ঘুমুতে, সবেতেই তখন দারুণ কষ্ট হবে। খেলতে গিয়ে অল্পেই হাঁফিয়ে পড়বে। কোন ভারি কাজ করতে পারবে না। যখন-তখন মাথা ব্যথা করবে। লেখাপড়া করতে ভাল লাগবে না।

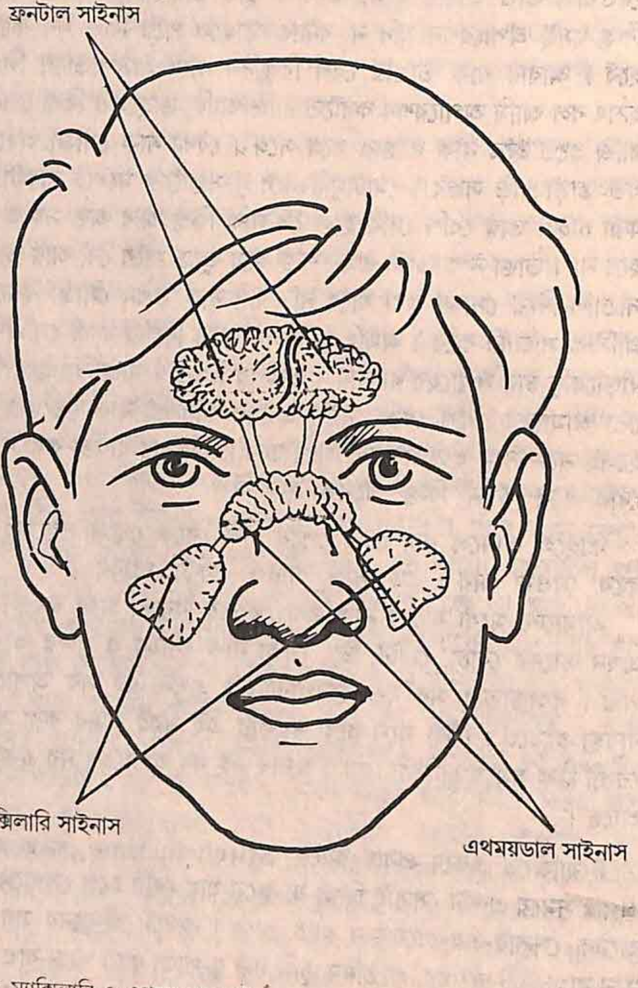
এখন বুঝলে তো নাকের হাড় ভাঙা কী রকম কষ্টের ব্যাপার! অথচ এই ভাঙা নাক ডাক্তারবাবুরা যে কত সহজে সিধে করে দেন তা তোমরা নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে না। তখন ভাববে, আরে এই ব্যাপার, এতো দুদিন চেষ্টা করলে আমিও শিখে নিতে পারি। সত্যিই তাই। নাকের হাড় সোজা করতে একরকমের সাঁড়াশির প্রয়োজন হয়। রান্না ঘরে যে রকমের সাঁড়াশি থাকে প্রায় সেই রকমই দেখতে। শুধু-একটু আকারে ছোট। সেই সাঁড়াশি দিয়ে বেঁকা নাকটাকে চেপে ধরে একটু চাপ দিলেই নাকটা ফের সোজা হয়ে যায়। রোগীর কোন কষ্টই হয় না। কারণ তখন তো তাকে ঘুম-পাড়িয়ে নেওয়া হয়। যাকে তোমরা অজ্ঞান-করা বল। ভাবছ, অজ্ঞান-করা তো কী দারুণ কষ্টের আর ভয়ের? আসেল ঠিক তার উল্টো। রোগীদের অজ্ঞান-করা আর জ্ঞান-ফেরান ডাক্তারবাবুদের কাছে কোন সমস্যাই নয়। এর জন্যে আজকাল কত ভাল-ভাল ওষুধ বেরিয়েছে, কত কী যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে তা অন্য একদিন বলব। আগেকার কালে ব্যাপারটা কিন্তু সত্যিই খুব ভয়ের ছিল। বড় হয়ে তোমরা যারা ডাক্তারি পড়বে তাদের প্রথম-প্রথম মনে হবে বুঝি ম্যাজিক দেখছ। যারা অজ্ঞান করেন তাদের বলা হয় 'এনাস্‌থেটিস্ট'। তখন তোমাদের অনেকেই নিশ্চয় এনাস্‌থেটিস্ট হতে চাইবে। সার্জেন আর এনাস্‌থেটিস্টের মধ্যে খুব ভাব। যেমন রাজা আর মন্ত্রীর মধ্যে ভাল বোঝাপড়া থাকলে রাজ্য চলে চমৎকার, তেমনি সার্জেন আর এনাসথেটিস্টের মধ্যে ভাব থাকলে মানুষের দেহের রাজ্যেও চলে অবাধ অস্ত্রোপচার। এখন বুঝলে তো অপারেশনের নামে কখনই ভয় পাওয়া উচিত নয়। কেন এত কথা বলছি জান তো? নাক বেঁকে গেলে তা কখনই ওষুধের দ্বারা সোজা হবার নয়। অপারেশনই তখন একমাত্র চিকিৎসা। কিন্তু অপারেশন হবে শুনলেই আমাদের অনেকেই ঘাবড়ে

গিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু শুধু-শুধু ভয় পেয়ে কখনই পালান উচিত নয়। কারণ অপারেশন মানে তো সেই সাঁড়াশিটা দিয়ে নাকটাকে সোজা করে দেওয়া। তাও আবার ঘুমের মধ্যে। তুমি তার কিচ্ছু টেরও পাবে না। কিন্তু সেই অপারেশন যদি না করাও তাহলে পরে কিন্তু খুব কষ্ট পেতে হবে। আবার নাক ভাঙার বেশ কিছুদিন বাদে হাসপাতালে গিয়ে যদি হঠাৎ বল আমি অপারেশন করাতে রাজি আছি, তাহলেও কিন্তু চলবে না। রাজি হতে হবে নাক ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে। বেঁকা নাক সোজা করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। মোটামুটিভাবে দু-সপ্তাহের মধ্যেই নাকটা সোজা করা চাই। তার বেশি দেরি হলে সে নাক কিন্তু আর অত সহজে সোজা হবে না। ভাঙা নাক তখন এমন শক্ত হয়ে জুড়ে যাবে যে, আর তাকে ওই সাঁড়াশি দিয়ে সোজা করা যাবে না। সে নাক তখন সোজা করতে হবে প্লাস্টিক সার্জারি করে। অর্থাৎ যা ছিল দু-পাঁচ দিনের কাজ সে এখন হয়ে দাঁড়াবে দু-চার সপ্তাহের ব্যাপার। তারপর প্লাস্টিক-সার্জারির হাসপাতালও তো আমাদের দেশে বেশি নেই। এইসব কারণেই নাক ভেঙেছে সন্দেহ হলেই সঙ্গে-সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। দেরি হলে তখন কিন্তু অনেক হয়রানি।

তাহলে জানলে তো চোট পেয়ে নাক বেঁকে গেলে সহজেই সোজা করে নেওয়া যায়। এই সঙ্গে আরও একটা সুখবর দিই।

আমাদের মধ্যে যাদের নাক জন্ম থেকেই বিকৃত, ইচ্ছে করলে তারাও এখন তাদের বোঁচা, মোটা, উঁচু, বেঁকা নাক সোজা ও সুন্দর করে নিতে পার। কলকাতার সব বড় হাসপাতালেই এখন এই সব অপারেশনের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার এই সবই সম্ভব করা যায় যদি রোগী ঠিক সময়ে হাজিরা দেয়। অর্থাৎ এই সব অপারেশনের একটা সময় আছে।

ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে, Stitch in time, saves nine অর্থাৎ সময়ে একটা সেলাই দিলে যা জুড়ে যায় দেরি হলে সেখানে হয়তো অনেক সেলাই-এর প্রয়োজন হতে পারে। কথাটা জীবনের সব সময়ই মনে রাখা উচিত। ধর, প্রতিদিন তুমি যদি দু-পাতা করে পড়ে যাও তাহলে পরীক্ষার আগে আর রাত জেগে-জেগে পাতার-পর পাতা পড়ার দরকার



ফ্রনটাল, ম্যাক্সিলারি ও এথময়ডাল সাইনাসসমূহ।

হয় না। কারণ তখন তো তোমার সবই তৈরি। তখন খেলতে-খেলতে পরীক্ষা দিলেও ফার্স্ট।

সাইনোসাইটিস হয়েছে !

আচ্ছা তোমার কী রোজ-রোজ সর্দি হয় আর মাঝে-মাঝে মাথা ব্যথা করে ? সর্দিতে কী পচা-পচা গন্ধ পাও ? সেই সঙ্গে নাকটাও কী বন্ধ হয়ে গিয়ে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় ? এই রকম সব কষ্ট থাকলে ভাবা যেতে পারে 'সাইনোসাইটিস' হয়েছে। 'সাইনোসাইটিস' মানে সাইনাসের প্রদাহ বা ইনফেকসন।

কিন্তু 'সাইনাস' কাকে বলে জান কী ? সাইনাসের বাংলা মানে হল গহ্বর। নাকের চারদিকে যে হাড়গুলো আছে, যেমন কপাল, চোয়াল, এরা সবাই ফাঁপা। আর ওই ফাঁপা গহ্বর গুলোকেই বলা হয় 'সাইনাস'। (ছবি-২) সাইনাসগুলোর অবস্থান অনুসারে ওদের নানান রকম নামও আছে। যেমন কপালের হাড়ের মধ্যে যে গহ্বর আছে তার নাম 'ফ্রনটাল সাইনাস'। চোয়ালের মধ্যে গহ্বরটির নাম 'ম্যাক্সিলারি সাইনাস'। এই প্রধান দুটি 'সাইনাস' ছাড়াও নাককে ঘিরে আরও কয়েকটি ছোট ছোট 'সাইনাস' থাকে। যেমন 'এথময়েড সাইনাস' ও 'স্ফিনয়েড সাইনাস'।

নামগুলো কী কঠিন, তাই না। আসলে এইসব নাম তোমরা এর আগে কখনও শোননি তো তাই এত কঠিন লাগছে। তোমাদের মধ্যে যারা বড় হয়ে ডাক্তারি পড়বে তাদেরও প্রথম-প্রথম এই রকম অনেক নাম উচ্চারণ করতে কী মনে রাখতে দারুণ কষ্ট হবে। এক-এক সময় মনে হবে, দূর আর পড়ে দরকার নেই। ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যাই। কিন্তু কদিন বাদেই দেখবে ওই বিদঘুটে নামগুলো কেমন যেন মুখস্থ হয়ে গেছে। তখন চেষ্টা করলেও আর তাদের ভুলতে পারবে না।

'এথময়েড' সাইনাসগুলো থাকে নাকের পাশের দেওয়াল আর চোখের মাঝের দিকে দেওয়ালের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গার মধ্যে। আর

'স্ফিনয়েড' সাইনাস থাকে নাকের পিছনে, 'স্ফিনয়েড' অস্থির ভিতরে।

স্বাভাবিক অবস্থায় এই সাইনাসগুলো হাওয়ায় ভর্তি থাকে। নিশ্চয় ভাবছ, হাড়ের মধ্যে আবার হাওয়া ঢুকবে কী করে। নাকের মধ্যে দিয়ে সর্বদাই হাওয়া চলাচল করছে। সেই হাওয়াই সাইনাসের মধ্যে ঢুকে ওদের হাওয়ায় পূর্ণ রাখে। তাহলে কী সাইনাস আর নাকের মধ্যে যাতায়াতের কোন পথ আছে ? হ্যাঁ, নাকের পাশের দেওয়ালে বেশ কয়েকটা ছোট-ছোট ছিদ্র থাকে। ওরা সবই ওই সাইনাসদেরই ছিদ্রপথ। আবার ওইসব ছিদ্রপথ দিয়ে যাতে সাইনাস-এর মধ্যে যখন-তখন যা-তা কিছু না ঢুকে যেতে পারে তার জন্যে ওদের মুখের ওপরে ঢাকনারও ব্যবস্থা আছে, যাদের বলা হয় 'টারবিনেট' বা 'নসা-উপাস্থি'। বড় হয়ে যারা 'এনাটমি' পড়বে তারা সবাই এইসব নিজের চোখেই দেখতে পাবে।

নাক আর সাইনাসদের মধ্যে যাতায়াতের পথ থাকায়, নাক থেকে সাইনাসের মধ্যে যেমন হাওয়া প্রবেশ করতে পারে, তেমনি অনেক সময়েই আবার নাকের নানান রোগও সাইনাসদের আক্রমণ করতে পারে।

এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ, তোমাদের বেশি ঠাণ্ডা লাগাতে দেখলে, জল ঘাঁটতে দেখলে কী ধুলোবালি ঘাঁটতে দেখলে বড়রা কেন বকাঝকা করেন ? তোমরা ছোট তাই জান না এইসব অসাবধানতা থেকে কত কী ঘটে যেতে পারে। ভাব, মাথায় একটু ঠাণ্ডা লাগালে অথবা গায়ে গরম জামা না রাখলে কী আর এমন হয়। একটু বেশিক্ষণ ধরে পুকুরে সাঁতার কাটলেই বা ক্ষতি কী।

এই সব অন্যায় করলেই প্রথমে নাকে সর্দি হবে তারপর চিকিৎসা হতে একটু দেরি হলেই 'সাইনোসাইটিস' হবে। অর্থাৎ নাকের ইনফেকসন তখন সাইনাসকেও আক্রমণ করবে। ফলে সাইনাসেও সর্দি জমবে। তোমরা তো জানই সর্দি হলে নাক কী রকম বন্ধ হয়ে যায়। নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া মানেই সাইনাসের ছিদ্রপথগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ এবারে সাইনাসের মধ্যে সর্দির সৃষ্টি হলে তারা আর বাইরে আসতে পারবে না। আর তখন মাথা ভারি হবে, যন্ত্রণা করবে। ঠিক বুঝতে পারবে যে এবার মাথায় সর্দি বসেছে। মাথায় সর্দি বসা মানে কী বুঝতে পেরেছ তো ? অর্থাৎ 'সাইনোসাইটিস' হয়েছে।

সাইনাসে সর্দি জমা খুবই কষ্টের। কারণ তখন মাথা ব্যথা করবে,

চোখে ব্যথা হবে, লেখাপড়া করতে কষ্ট হবে, জ্বর হবে, গা-হাত-পা ব্যথা হবে।

মাথা তো অনেক কারণেই যন্ত্রণা করতে পারে। কথায় বলে মাথা থাকলেই ব্যথা থাকবে। কিন্তু সাইনাসে সর্দি জমার জন্যে যে ধরনের মাথা ব্যথা হয় তা কিন্তু একদম অন্য রকমের। তার ধরণ-ধারণ এমনই সঠিক যে একবার শুনলেই বুঝে ফেলা যায় এ ব্যথা নিশ্চয় সাইনোসাইটিসের জন্যে। 'সাইনোসাইটিস' আবার দু রকমের হয়। এক, 'একিউট সাইনোসাইটিস' আর দুই, 'ক্রনিক সাইনোসাইটিস'। একিউট সাইনোসাইটিস মানে হঠাৎ সর্দি জমে যাওয়া আর ক্রনিক সাইনোসাইটিস মানে যাদের অনেক দিন ধরে জমে আছে। এখানেই জেনে রাখা ভাল যে কোন আকস্মিক বা হঠাৎ অসুখ করলেই তাকে 'একিউট' বলা হয়। আর 'ক্রনিক' মানে হচ্ছে পুরনো বা মেয়াদি রোগ।

নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করছে যে, কোন রকমের সাইনোসাইটিসে কী জাতীয় মাথা যন্ত্রণা করে ? একিউট সাইনোসাইটিস হলে ভোরের দিকে রোগীর মাথায় কোন যন্ত্রণাই থাকবে না। কিন্তু সূর্য ওঠার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তার মাথায় যন্ত্রণার শুরু হয়ে যাবে। আর যত বেলা বাড়তে থাকবে ততই তার মাথা-ব্যথাও বাড়তে থাকবে। আবার যখনই সূর্য ডুবে যাবে অমনি তার মাথা-ব্যথাও সেরে যাবে। ক্রনিক সাইনোসাইটিস হলে ঠিক এর উল্টো ঘটে। রোগী ঘুম থেকে উঠেই বলবে, 'ওরে বাপরে কী মাথা ব্যথা করছে রে।' কিন্তু যেই বেলা বাড়তে শুরু করবে অমনি তার মাথা-যন্ত্রণাও কমে যাবে, বিকালের দিকে মনেই থাকবে না যে সকালে তার অত কষ্ট ছিল।

আমাদের মধ্যে অনেকেই ভাবেন মাথা-যন্ত্রণা হওয়া মানেই বুঝি সাইনোসাইটিস হওয়া, এ কিন্তু খুবই ভুল ধারণা। মাথা-যন্ত্রণা অনেক কারণেই হতে পারে। সাইনোসাইটিস তারই একটা কারণ মাত্র।

ভাবতে নিশ্চয় খুব মজা লাগছে যে, কারও মাথা-যন্ত্রণা হলেই এখন ঠিক বলে দিতে পারবে যে সেটা সাইনোসাইটিস-এর ব্যথা কিনা। কিন্তু না। অনেকের ক্ষেত্রে হয়তো ও রকমের যন্ত্রণা নাও হতে পারে। কারও-কারও আবার মাথা-যন্ত্রণার সঙ্গে অথবা শুধু চোখ, কান বা দাঁতের ব্যথা হতে পারে। কারণ নাককে ঘিরে যেমন সাইনাসেরা থাকে তেমনি

সাইনাসদের ঘিরে আছে চোখ, কান আর দাঁত। তাই একের কষ্টে আর একজনের কষ্ট হতেই পারে। শুধু যন্ত্রণাই-বা কেন সাইনাসের জন্যে, তাদের অন্য অনেক রকমেরই অসুবিধে হতে পারে। যেমন ধর চোখের দৃষ্টি কমে আসতে পারে, কানে পুঁজ হতে পারে, কমও শুনতে পারে, অকালে দাঁত নড়ে যেতে পারে। যারা আরও দীর্ঘদিন ধরে ভোগে তাদের ক্ষেত্রে সাইনাসের ইনফেকসন গলায় এবং ফুসফুসে পৌঁছে গিয়ে গলা খুশ খুশ গলাধরা বা কাশিরও সৃষ্টি করতে পারে।

এখন বুঝতে পারছ তো সাইনোসাইটিস কী পাজি রোগ। সাইনোসাইটিসের জন্যে কারও-কারও নাক থেকে রক্তও পড়ে। এমন কী ইনফেকশন মাথায় পৌঁছে গিয়ে 'মেনিনজাইটিস' কী 'ব্রেন অ্যাবস্সেসে'র মত সব মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করতে পারে। দেখছ তো একটু ঠাণ্ডা-লাগান থেকে কত কি মারাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে। সেই জন্যেই বড়রা তোমাদের ঠাণ্ডা লাগাতে দেখলে অত বকাবকি করেন আর মাথা-যন্ত্রণার কথা শুনলেই ডাক্তারবাবু এক্সরে করে দেখে নেন সাইনোসাইটিস হল কিনা।

জান তো গ্রামের চেয়ে শহরেই বেশি সাইনোসাইটিস হয়। কারণ শহরের আবহাওয়া ধুলো-ধোঁয়া আর মানুষজনে ভর্তি। তার ওপর শহরে না আছে ফাঁকা মাঠ-ময়দান, না তেমন গাছপালা। গ্রামে যে সাইনোসাইটিস হয় তার কারণ সেখানে শহরের চেয়ে ঠাণ্ডা অনেক বেশি। আর সেখানকার বেশিরভাগ ছেলেমেয়েদেরই স্নান করতে হয় পচা পুকুরে কী নদীতে। তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করছ যে আজকাল সবাই কেমন পরিবেশে পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টায় মেতে উঠেছেন। সকলেই পথে-পথে গাছপালা রোপণ করে, আবহাওয়াকে ধুলো, ধোঁয়া, গ্যাস মুক্ত করে সুস্থভাবে বাঁচার চেষ্টা করছেন। এইভাবে সবাই মিলে চেষ্টা করে আমরা যদি সত্যিই কোনদিন আমাদের পরিবেশকে শুদ্ধ করে তুলতে পারি তাহলে শুধু সাইনোসাইটিস কেন আরও কত রকম রোগ কমে যেতে পারে।

অনেকেই ভাবে সাইনাস হলে বুঝি আর সারে না। এ কিন্তু একদমই ভুল ধারণা। একিউট সাইনোসাইটিস একটু চিকিৎসা করলেই সেরে যায়। ক্রনিক সাইনোসাইটিস হলে ডাক্তারবাবুরা যন্ত্রের সাহায্যে সাইনাস ধুয়ে

সর্দি বার করে, তাকে ভাল করে তোলেন। কারও-কারও ক্ষেত্রে অপারেশনেরও প্রয়োজন হয়।

এবার জেনে গেলে তো কি কি সাবধানতা নিলে সাইনোসাইটিসের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আর নিশ্চয় ভুল হবে না। কিন্তু তবু যদি আচমকা সর্দি লেগে যায় তাহলে ৭দিন ধরে নাকে ড্রপ ভিটামিন সি অ্যান্টি এলার্জির বড়ি খেও। তাও যদি নাকের সর্দি পেকে যায় তাহলে এরিথ্রোমাইসিন কি এমপিসিলিনের বড়ি কী সিরাপ খেও। সব জায়গায় তো নাকের ডাক্তার কী হাসপাতাল নেই। তাই ওষুধগুলো জানিয়ে রাখলাম, যা শুরুতে খেলে তীব্র সাইনোসাইটিস সারবেই।

এত সব জানার পর নিশ্চয় মনে হচ্ছে, সাইনাসগুলো না থাকলেই ভাল ছিল। তাহলে আর কোনদিনই আমাদের কারও সাইনাস হত না। কিন্তু না, সাইনাস না থাকলে আমাদের সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি। মাথার খুলিটা ফাঁপা না হয়ে যদি নিরেট হত তাহলে মাথাটা নিশ্চয় বেজায় ভারি হয়ে যেত। তখন সারাদিনই মাথা হেঁট করে বসে থাকতে হত। মাথা তুলে ঘুরে ফিরে বেড়ান, খেলাধুলো করা, কিছুই সম্ভব হত না। এমন কি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ কী না বলার জন্যেই একটা লোকের প্রয়োজন হত।

খুলিটা নিরেট হলে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হত ব্রেনের। কারণ মাথায় তখন কোন আঘাত লাগলেই সেটা সোজা ব্রেনে পৌঁছে যেত। আর ব্রেনই তো আমাদের শরীরের প্রধান পরিচালক। তাই ব্রেন আহত হলে কী আর আমরা কেউ বাঁচতে পারতাম।

ব্রেনকে ঘিরে থাকে একটা জলের আস্তরণ। আবার খুলিটা ঘিরে আছে হাওয়া ভর্তি ফাঁকা গহ্বরেরা। ফলে বাইরের কোনও আঘাতকে ব্রেন স্পর্শ করতে হলে ফাঁকাগহ্বর, হাওয়া, জলের স্তর পেরিয়ে তবে তাকে স্পর্শ করতে হবে। দেখছ তো, ব্রেন যেহেতু শরীরের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু তাই তাকে কত সাবধানে দেহের মধ্যে রাখা হয়েছে।

তোমরা কিন্তু অনেকেই তোমাদের বই, খাতা পেনসিল, রবারগুলো রেখে দাও যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। আর স্কুলের বাক্সের মধ্যে পুরে রাখ মার্বেল, ফেদার, বেলুন আর রবারের বল। এটা কিন্তু খুবই অন্যায়।

মুন্নিকে বোলো না।

আজকে যে মেয়েটার কথা বলব, তাকে তোমরা সবাই চেন। কিন্তু সে অনেক করে তার নামটা বলতে বারণ করেছে। তাই তার আসল নামটা আর বললাম না। ধর, তার নাম মুন্নি।

সেদিন সকালবেলা মুন্নিদের বাড়ি গেছি। দেখি কী মুন্নির মা তখন মুন্নিকে ধরে খুব ঠ্যাঙাচ্ছেন। সাবান-গোলা লাঠিটা দিয়ে ওর পিঠে একটা করে বাড়ি দিচ্ছেন আর মুন্নি 'ও রে মা রে, গেলুম রে' বলে চেঁচাচ্ছে।—

মুন্নির মা এমনিতে খুবই ঠাণ্ডা। মুন্নিকে কখনই উনি বড় একটা মারধর করেন না। তাই ওকে অমন রাগতে দেখে আমি তো অবাক!

এদিকে মুন্নি করেছে কী, আমাকে দেখেই, ওর মা-র হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে এসে, 'ও কাকু বাঁচাও', বলে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।

মাকে রাগিয়ে দিয়ে কাকুর পিছনে লুকলে কী চলে। তাই ওর মা তখন আরও রেগে গিয়ে বললেন, 'দেখি আজ কাকু তোকে কী করে বাঁচায়।' এই বলে দৌড়ে এসে যেই ওকে আর এক ঘা দিতে গেছেন, অমনি সেটা হাত ফসকে সোজা আমার মাথায়। আর সঙ্গে-সঙ্গেই আমার মাথাটা ফুলে আলু। আমি তো মাথায় হাতচাপা দিয়ে তখন একটা সোফায় বসে পড়েছি। আর তাই দেখে ওর মা লজ্জায় পড়ে মুন্নিকে মারার কথাটা ভুলে জিভ বার করে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ওঁকে অমন লজ্জা পেতে দেখে আমি বললাম, 'যাকগে যা হবার তাতো হয়েইছে। এখন বলুন তো মুন্নিকে হঠাৎ এই সাতসকালে অত শাসন করছিলেন কেন?'

তখন তিনি যা বললেন তা শুনে আমি তো অবাক। 'আশ্চর্য! এতদিন আপনাদের বাড়ি আসছি, একথা তো কোনদিন বলেন নি।'

মুন্নির মা বললেন, 'তাহলে এখন বুঝুন আমার কত কষ্ট। এতবড় মেয়ে, রোজ কত করে বোঝাচ্ছি, বারণ করছি, ভয় দেখাচ্ছি, কিছুতেই বুঝছে না।'

'ইস, ছ'বছরের মেয়ে আবার কখনও নিয়ম করে বিছানা ভেজায়

নাকি ?' আমি শুনেই খুব বিরক্ত হলাম।

মুন্নির মা বললেন, 'অনেকদিন আগেই ভেবেছিলাম আপনাকে বলব। কিন্তু ও-ই অনেক করে বারণ করেছিল। তাই বলিনি।'

আমি বললাম, 'ব্যাপারটা কিন্তু খুবই চিন্তার। কারণ শুনেছি ডাক্তারবাবুরা বলেন, তিন কী বড় জোর পাঁচ বছরের মধ্যে ওই বদঅভ্যাসটা সবারই বন্ধ হয়ে যাবার কথা। পাঁচ বছর পরও যদি ওই অভ্যাস না যায় তাহলে সেটা কিন্তু রোগ। এবং তার জন্যে ডাক্তার দেখান খুবই প্রয়োজন।'

মুন্নির বাবা বললেন, 'তাহলে তাই হোক। চল, আজই আমরা ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।'

ডাক্তারবাবুর নাম শুনেই মুন্নি জোর কাঁদতে শুরু করল। তখন ওর মা রেগে-মেগে বললেন, 'তুমি যতই কাঁদ আর যতই চেঁচাও আজ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবই।'

মুন্নিকে নিয়ে ওরা ডাক্তারখানায় গেলেন। ডাক্তারবাবু সব শুনেটুনে গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওর কী কোন ছোট ভাই-বোন আছে ?'

'এই রোগের সঙ্গে ছোট ভাই-বোন থাকার কী সম্পর্ক ?' মুন্নির মা জানতে চাইলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'অনেক সময়েই নাকি ছোটরা তাদের ভাইবোনদের মনে-মনে একদমই সহ্য করতে পারে না। তারা ভাবে বুঝি সে-ই তার বাবা-মার আদরটা কেড়ে নিচ্ছে। তাই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে তারা অনেক সময়েই ওইরকম নানান অদ্ভুত ব্যবহার করে। কেউ বিছানা ভেজায়। কেউ-বা আবার নতুন করে বোতল খেতে চায়। কেউ-কেউ মায়ের কোল থেকে নামতেই চায় না। এই রকম আরও কত কী।'

কিন্তু মুন্নির তো কোন ভাইবোন নেই।

তখন ডাক্তারবাবু বললেন, 'আচ্ছা আপনারা ওকে রোজ ঠিক নিয়ম করে শোয়াবার আগে ও মাঝরাতে একবার করে বাথরুমটা ঘুরিয়ে আনেন তো ?'

মুন্নির মা বললেন, 'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, আমি রোজ নিয়ম করেই ওকে ওঠাই। কিন্তু তাও ঠিক ও বিছানা ভেজাবেই।'

'তাই নাকি ?' ডাক্তারবাবু বললেন, 'এত ভাল ট্রেনিং পেয়েও ও অভ্যাসটা ছাড়তে পারছে না। তাহলে কী আপনাদের বাথরুমটা খুব নোংরা কী অন্ধকার ? সেখানে আরশোলা কী ইঁদুর-টিঁদুর কিছু আছে নাকি ?'

'ও মা ! সে কী ? ওইসব কারণেও আবার এ রোগ হয় নাকি ?' মুন্নির মা তো অবাক।

ডাক্তারবাবু বুঝিয়ে দিলেন। অনেক সময়েই ইঁদুর কী আরশোলার ভয়ে বাচ্চারা বাথরুমে গিয়ে আসল কাজটি না করেই পালিয়ে আসে। ফলে বিছানা না ভিজিয়ে আর উপায় থাকে না।

মুন্নির বাবা বললেন, 'কিন্তু আমাদের তো নতুন বাড়ি। সেখানে ওরকম কিছুই নেই।'

'তাহলে ?' এবার ডাক্তারবাবু সত্যিই খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। তারপর কী-সব ভেবেটেবে মুন্নিকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। একটা টেবিলে শুইয়ে, মুন্নির কোমরটা বেশি করে দেখতে লাগলেন।

'অমন করে ওর কোমরে কী দেখছেন ডাক্তারবাবু ?' মুন্নির মা জিজ্ঞাসা করেলন।

'ওইখানেই তো যত ঝঞ্ঝাট থাকে।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'বিশেষ দুটি অসুখে বাচ্চারা আক্রান্ত হলে এইরকমের ঝঞ্ঝাট হতে পারে। একটির নাম, 'স্পাইনা বাইফিডা', এবং আর একটির নাম 'মেনিংগোশিল'। আর ওই দুটি রোগই হয় জন্মগত কারণে।'

মুন্নির বাবা বললেন, 'এ যে বিরাট নাম। কিছুই তো বুঝলাম না।'

ডাক্তারবাবু ফের বুঝিয়ে দিলেন। 'স্পাইনা বাইফিডা' মানে মেরুদণ্ডের কোথাও ফাঁক থাকা। অনেকগুলো 'ভার্টিব্রা' বা 'কেশেরুকা' জুড়ে জুড়ে মেরুদণ্ড তৈরি হয়। প্রতিটি ভার্টিব্রাই এক একটি হাড়ের রিংয়ের মত। যার ভিতর দিয়ে স্পাইনাল কর্ড বা সুষুম্নাকাণ্ড গমন করে। কোমরের কাছে স্পাইনাল কর্ডের অংশ থেকে মূত্রাশয়ের প্রয়োজনীয় স্নায়ুগুলি জন্ম নেয়। কোমরের কোন ভার্টিব্রায় ফাঁক থাকলে, ওইসব স্নায়ুরা কমজোরি হয়। ফলে ওইরকমের নানা অসুবিধা দেখা দেয়। কোমরের মেরুদণ্ডের ওপর মেনিংগোশিল বা ঝিল্লিস্ফিতি ঘটলেও ওই একই ঘটনা ঘটতে পারে।

'এইসব রোগ কী করে বোঝা যায় ?' মুন্নির বাবা জানতে চাইলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'মেনিংগোশিল খুবই সহজে বোঝা যায়। কারণ ওই রোগে কোমরে জন্ম থেকেই একটা ফুলো বা উচু ভাব থাকে। আর স্পাইনা বাইফিডা বুঝতে হলে এক্সরে করা দরকার। অবশ্য কখন কখন ব্যাপারটা এক্সরে ছাড়াও আন্দাজ করা যেতে পারে।'

'কী ভাবে।' মুন্নির মা এগিয়ে বসলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'স্পাইনা বাইফিডা থাকলে অনেক সময় কোমরের ঠিক সেই স্থানের চামড়ার ওপরে একগুচ্ছ চুল দেখতে পাওয়া যায়।'

মুন্নির সেইদিনই এক্সরে হল। কিন্তু না, এক্সরেতে সে রকম কোন রোগ ধরা পড়ল না।

তখন ডাক্তারবাবু বললেন, 'এবার তাহলে আপনারা মুন্নিকে প্রথম লোভ দেখান।'

কী রকম ? কী রকম ?' মুন্নির বাবা জানতে চাইলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'ওকে বলুন, ও যেদিন বিছানা ভেজাবে না, সেদিনই ও একটা টফি পাবে।'

মুন্নির বাবা বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে বুঝেছি।'

তখন মুন্নির মা বললেন, 'কিন্তু তাতেও যদি না হয় ?'

'তাতেও না থামলে ওষুধ দিতে হবে।' ডাক্তারবাবু বললেন।

ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখে দিলেন,—ডেপসোনিল অথবা এ্যান্টিডেপ, ২৫ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট, রোজ রাত্রে একটা করে খেতে হবে এক থেকে দুমাস।'

'এতেই সেরে যাবে ?' মাত্র একটা ওষুধ লেখায় ওর মা খুব অবাক হলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। ওর তো আর কোন রোগ নেই। তাই এতেই ও সেরে যাবে। আসলে ওর ঘুমটা খুবই গাঢ়। এই ওষুধে ঘুমটা পাতলা হবে। তখন নিজেই বুঝতে পারবে কখন ওঠা দরকার। আর এইভাবেই রোজ উঠতে-উঠতে শেষে একদিন ওর বদঅভ্যাসটা চলে যাবে।'

মুন্নি সব শুনেটুনে কী বললে জান তো ? সে বলল, 'টফি নয়, যদি

আমাকে রোজ একটা করে ডলপুতুল কিনে দাও তাহলে আমি ঠিক ভাল হয়ে যাব।'

বার বার টনসিল ফুলছে

সৌগত সকালে ঘুম থেকে উঠেই অনুভব করল ওর গলায় দারুণ ব্যথা করছে। ঢোক গিলতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে। সৌগত দারুণ চিন্তায় পড়ে গেল। কারণ ও খুব ভাল ভাবেই জানে এরপর কী-কী ঘটবে। প্রথমে জ্বর আসবে। তারপর কাশি, সর্দি আর গা-হাত-পায়ে ব্যথা হবে। ভাবতে-ভাবতে সৌগতের চোখ বেয়ে টস্‌টস্ করে মুক্তোর মত কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। গতকাল সন্ধ্যায় কালুমামা দুটো আইসক্রীম ফ্রিজে পুরে রেখে গেছে। আজ বিকেলে আবার ভিক্টোরিয়ায় বেড়াতে যাবার কথা আছে। মা জানতে পারলে ওই আইসক্রীমও ছুঁতে দেবেন না আর বেড়াতেও যেতে দেবেন না।

ওর মা ঘরে ঢুকে সৌগতের চোখে জল দেখে অবাক, 'একি ! তুমি কাঁদছ কেন ?'

সব শুনে তিনি রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, 'কাল পইপই করে বারণ করেছিলুম, ফুটবল খেলে, অত ঘেমো গায়ে জল ঢেল না। তোমার টনসিল ফুলবে। কী মনে পড়ছে ?"

সৌগতের মনে পড়ে গেল কাল সন্ধ্যায় সত্যিই ওর মা ওকে ওই কথাগুলো বারবারই বলেছিলেন। মার কথা না শুনলে কেউ এমনি ভাবে যে হাতে-হাতে শাস্তি পেতে পারে সেটা বোধহয় ও ধারণাও করতে পারে নি।

পরীক্ষার আর মাত্র সপ্তাহখানেক বাকি। তাছাড়া স্কুল বন্ধ হলেই দার্জিলিং বেড়াতে যাওয়ার কথা। কী জানি এখন কী করে কী হবে।

তোমরা হয়তো ভাবছ সৌগতের গলা ব্যথার জন্যে স্বাতীকাকীমার অত বেশি চিন্তা করার কী হল। ছোটবেলায় ও রকম সবারই হয়। দুএকদিন

ওষুধ খেলেই তো সেরে যায়। আসলে সৌগতের ব্যাপারটা একটু অন্যরকমের। খুব ছোটবেলা থেকেই মাঝে-মাঝেই ওর গলায় ব্যথা হত। কিন্তু সেটা এখন বাড়তে-বাড়তে প্রায় প্রতি মাসেই দেখা যাচ্ছে। ফলে ওর এর মধ্যে অনেকবার স্কুল কামাই হয়েছে। সৌগতের রেজাল্টও ক্রমেই খারাপ হচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি ওর চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা দরকার।

একটু পরেই অদিতবাবু, মানে সৌগতের বাবা, বাজার থেকে ফিরে সব শুনে ঠিক ওর মায়ের মতই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন।

এইসব গোলমালের মধ্যে হঠাৎ মীরাকাকীমা এসে হাজির। মীরাকাকীমাকে চিনতে পারছ তো ? মিমির মা। তিনি সব শুনে উল্টে চেঁচামিচি জুড়ে দিলেন। বললেন, 'সৌগত যে ভুগছে সে কী ওর দোষ ? ছোটবাচ্চারা একটু খেলবে, জল ঘাঁটবে কী আইসক্রীম খাবে সেটা কী এমন বেশি কথা হল শুনি ? ও ভুগছে, ওর গলায় সেপটিক টনসিল আছে বলে। আর তোমাদের তো কবেই ডাক্তারবাবুরা জানিয়ে দিয়েছেন যে, অপারেশন না করলে ওর ঘন-ঘন গলাফোলা আর জ্বর হওয়া থামবে না। তোমরা সব জেনে-শুনে অপারেশনটা না করিয়ে ওর গলাতে ওই ঢোল আর তবলাগুলো ঝুলিয়ে দিয়েছ।' ঢোল আর তবলা মানে বুঝেছো তো ? মাদুলি আর কবচ।

স্বাতীকাকীমা বললেন, 'কথাটা তো ঠিকই বলেছেন দিদি। কিন্তু আমার শ্বশুরমশাই যে কিছুতেই অপারেশনে মত দিচ্ছেন না। তিনি বলছেন অপারেশন করালেই নাকি ওর শরীরের অন্য অনেক ক্ষতি হবে, গলার স্বর পালটে যাবে, বুদ্ধি কমে যাবে। তাই…'

স্বাতীকাকীমা বোধহয় আরও কিছু বলতেন। কিন্তু তার আগেই মীরাকাকীমা ফের চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওর ঠাকুর্দা তো সেকালের মানুষ। তাঁদের সময়ে অপারেশন-টপারেশন যত ভয়ের ছিল এখনও কী তাই আছে নাকি ? ওই তো মনি আর পম্পা একদিনে দুই-বোন অপারেশন করিয়ে এল। ওদের গলার স্বর পালটে গেছে না বুদ্ধি কমে গেছে ? তোমরা যখন এতই ভয় পেয়েছ, তখন আমি না হয় আজই ওকে আর একবার কোন বড় গলার ডাক্তারকে দেখিয়ে আনব। তারপর তিনি যা বলবেন, তা তোমাদের করতেই হবে। সৌগতকে আর এইভাবে কিছুতেই

ভুগতে দেওয়া চলবে না।'

সেদিনই বিকালে ওরা সবাই সত্যিই সৌগতকে ডাক্তার রায়ের কাছে নিয়ে গেলেন।

ডাঃ রায় ওকে পরীক্ষা করে হেসেই অস্থির। বললেন, 'টনসিল সারাতে শেষে ছেলের গলায় তাবিজ কবচ পরিয়েছেন ?'

মীরাকাকীমা এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ডাঃ রায় তাঁকে ইশারায় থামতে বলে বললেন, 'আসলে আগেকার কালে অপারেশন করানো তো খুব ভয়ের ছিল। তাই সেকালের মানুষেরা অপারেশনের নাম শুনলেই এখনও ভয় পান। ভাবেন, এবার তাহলে বুঝি রোগীর কোন বিপদ ঘটতে চলেছে।'

স্বাতীকাকীমা বললেন, 'তাহলে আপনি বলছেন অপারেশনে কোন ভয় নেই ?'

ডাঃ রায় বললেন, 'এখন আমাদের দেশে ভাল হাসপাতাল এবং স্পেশালিস্ট—দুটোরই আর কোন অভাব নেই। তাই অপারেশন করিয়ে কোন বিপদ ঘটবে এ যেন আর ভাবাই যায় না।'

ডাঃ রায় একটু থেমে বললেন, 'সেপটিক টনসিল নিয়ে বসে থাকাটা কিন্তু খুবই ভয়ের। কারণ ওর থেকে অনেক সময়েই এমনই সব মারাত্মক অসুখ হয় যা রোগীকে একদম কাবু করে দিতে পারে।'

অদিতবাবু চমকে ওঠে বললেন, 'তাই নাকি ?'

—'নিশ্চয়।' ডাঃ রায় বললেন, 'জানেন তো, টনসিল থেকে হার্ট, কিডনি, জয়েন্ট সব কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাছাড়া কানে পুঁজ কী চোখেও প্রদাহের সৃষ্টি করে রোগীকে কালা কী দৃষ্টিহীনও করে দিতে পারে। কারও কারও তো হঠাৎই টনসিলের চারদিকে পুঁজ জমে ওঠে 'পেরিটনসিলার অ্যাবসিসও' হয়ে যায়। তখন তাৎক্ষণিক অপারেশনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অদিতবাবু বললেন, 'কিন্তু আমরা যে শুনি টনসিল কেটে দিলে গলার স্বর পালটে যায়। রোগী দারুণ মোটা হয়ে যায়, শরীরে অন্য সব অসুখ-বিসুখ হয়। এসব কী সত্যি ?'

ডাঃ রায় হেসে বললেন, 'ট্রামে-বাসে অবশ্য টনসিল অপারেশন নিয়ে এইরকমই সব অদ্ভুত আলোচনা হয় জানি। কিন্তু তাতে কোন শিক্ষিত মানুষের কান-দেওয়া উচিত নয়। কারণ টনসিল স্বাভাবিক স্বর সৃষ্টির

জন্যে কোন ভূমিকাই পালন করে না। বরং তা সেপটিক হয়ে গেলে গলবিল এবং স্বরযন্ত্রে মেয়াদি প্রদাহ ঘটিয়ে কণ্ঠস্বরকে নষ্ট করে দিতে পারে। যা অপারেশনের পর সেরে যায়।'

—'বলেন কী ?'

—'ঠিক তাই।' ডাঃ রায় বললেন, 'অপারেশনের পর মোটা হয়ে যাওয়ার ধারণাটাও একদম মিথ্যে। আসলে টনসিলের জন্যে বারবার জ্বর-জ্বালা হওয়ায় রোগী ক্রমেই শুকিয়ে যায়। তাই অপারেশনের পর রোগমুক্তি হলে তার মোটা নয়, বলতে পারেন স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠতে পারে। মোটা হয় তারাই যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খায়। আচ্ছা, টনসিল অপারেশন হয়নি অথচ তার গলার আওয়াজটা ধরা-ধরা অথবা চেহারাটা খুব মোটা, কী অন্য কোন রোগে ভুগছেন, এরকম কাউকেই কী আপনারা দেখেন নি ?'

—'তা কেন দেখব না' অদিতবাবু হেসে উত্তর দিলেন।

'বেশ এবার বলুন তো, টনসিল অপারেশন হয়েছে অথচ দারুণ গান করেন বা আবৃত্তি করেন এরকম কাউকেও কী আপনারা চেনেন না ?'

—'খুব খুব।'

ডাঃ রায় বললেন, 'তাহলে ওই রকম-সব অদ্ভুত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নিজের ছেলেটাকে ভোগাচ্ছেন কেন বলুন তো ?'

অদিতবাবু বললেন, 'না এবার আর ওকে ভোগাব না। কিন্তু তার আগে আপনি দয়া করে আমাদের বুঝিয়ে দেবেন কী, টনসিল অপারেশনকে কেন্দ্র করে এইসব আজে বাজে কথা কেন শুনতে পাওয়া যায় ?'

ডাঃ রায় বললেন, 'ব্যাপারটা খুবই ইন্টারেস্টিং। আমাদের মধ্যে কার না ইচ্ছে যায় বলুন যে সবাইকে গান শুনিয়ে মোহিত করে দিই। কিন্তু আমাদের অধিকাংশেরই তো গানের গলা থাকার কথা নয়—তাই না ? কিন্তু যাদের টনসিল অপারেশন করা আছে, তারা কেউ গান গাইতে চেয়ে বিফল হলে তাদের অনেকেরই বাবা-মা তখন রটিয়ে দেন যে যেহেতু ওর টনসিল অপারেশন করা হয়েছে, তাই ও ভাল করে গান গাইতে পারে না। অর্থাৎ তাদের গান গাইতে না পারাটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে না নিয়ে তারা সেটাকে একরকমের পরাজয় বলে ভেবে নিয়ে তার জন্যে একটা

কারণ দেখাবার চেষ্টা করেন।'

—'আশ্চর্য !' স্বাতীকাকীমার খুব অবাক লাগল।

—'হ্যাঁ সত্যিই আশ্চর্যের। বিশেষ করে আমাদের মত দেশে, যেখানে অপারেশনের কথায় অনেকেই ভয় পান, সেখানে এইসব বিভ্রান্তিকর মতবাদে অনেকেই সময়ে অপারেশন না করিয়ে তাদের রোগীকে তারা অন্য কোন বিপদের দিকে ঠেলে দেন।'

অদিতবাবু বললেন, 'ডাক্তার রায় বিরক্ত হবেন না, আমি আপনার কাছে আর একটা কথা জানতে চাইব। অপারেশনের পর সৌগতের ফের গলা ব্যথা আর জ্বর হবে না তো ?'

ডাঃ রায় বললেন, 'এবার সত্যিই আপনি একটা দারুণ প্রশ্ন করেছেন। কারণ এরকম প্রায়ই ঘটতে দেখা যায় যে রোগীর অপারেশনের পর তার আসল কষ্টগুলো মোটেই কমল না। তখন তারা খুবই হতাশ হন। কিন্তু সৌগতের বেলায় সেরকম হবার কোন সম্ভাবনা নেই।'

—'কেন ? কেন ?' স্বাতীকাকীমা জানতে চাইলেন।

—'সেটা হয় যদি কেউ ভাইরাল টনসিলাইটিসকে সঠিক চিনতে না পেরে তাকে অপারেশনের দ্বারা সারাবার চেষ্টা করেন—তখন। টনসিল নানা প্রকারের ভাইরাস অথবা জীবাণুর দ্বারা সেপটিক হতে পারে। ভাইরাসের দ্বারা যে টনসিলাইটিস হয় তা সাধারণতই আট কী ন বছর পর্যন্ত শিশুদের ভোগায়। তারপর সেইসব ভাইরাসগুলি শিশুটির গলা থেকে আপনিই চলে যায়। তাই শিশুটিও ওই বয়সের পর আবার আপনিই ভাল হয়ে ওঠে। জীবাণুঘটিত মেয়াদী টনসিলাইটিসের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হবার নয়। সেক্ষেত্রে যতক্ষণ না রোগীর টনসিল অপারেশন করে বার করে দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ সে ভুগতেই থাকবে।'

—'কোন রোগীর কী ধরনের টনসিলাইটিস হয়েছে তা কেমন করে ধরা যায় ?'

—'খুব সহজেই। ভাইরাল টনসিলাইটিসের রোগীর আক্রান্তকালে তার সমস্ত গলবিলটাই লাল হয়ে থাকে, সেই সঙ্গে তার চোখ দুটোও লাল হয়ে ওঠে, নাক দিয়ে জল ঝরে। জ্বরও হয় খুব বেশি। আর রোগীকে তখন খুব পরিশ্রান্ত মনে হয়। কিন্তু ব্যাকটোরিয়াল বা জীবাণু ঘটিত টনসিলাইটিস হলে, গলবিলের মধ্যে দেখা যায় দুধারে টনসিল দুটোই শুধু

ফুলে উঠেছে। আর তাদের গায়ে তখন সাধারণত সাদা-সাদা পুঁজের স্পট্ পড়ে। খাওয়ার সময় রোগী গলায় দারুণ ব্যথা অনুভব করে। গায়ে জ্বর থাকলেও, রোগী কিন্তু তেমন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে না।'

'ভাইরাল টনসিলাইটিসের রোগীদের অনেকটা ইনফ্লুয়েনজার রোগীর মত দেখায়—তাই না?' মীরাকাকীমা জানতে চাইলেন।

—'ঠিক বলেছেন। ফ্লুও তো ভাইরাস দিয়ে হয়।'

স্বাতীকাকীমা বললেন, 'এইবার আমি বুঝতে পেরেছি, অত জ্বর নিয়েও সৌগত কেন এত লাফালাফি করে বেড়াতে পারে।'

—'ভাইরাল টনসিলাইটিসের চিকিৎসা তাহলে অপারেশন নয়?' অদিতবাবু প্রশ্ন করলেন।

—'মোটেই না। সেই সময়ে আমরা রোগীকে শুধু লক্ষণ অনুসারে ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করি।'

অদিতবাবু বললেন, 'আচ্ছা, আজকাল তো শুনি কত সব ভাল ভাল এন্টিবায়োটিক বেরিয়েছে। তাহলে অপারেশন না করে, সেই সব এন্টিবায়োটিক দিয়ে রোগীর সেপটিক টনসিল সারানোর চেষ্টা করা হয় না কেন?'

—'আসলে পুরনো সেপটিক টনসিলাইটিসের ক্ষেত্রে জীবাণুরা সব বসবাস করে টনসিলের অনেক গভীরে, আর তার চারদিকে থাকে ঘন তন্তুর বেড়াজাল, যা ভেদ করে এণ্টিবায়োটিকের পক্ষে ওইসব জীবাণুদের বিনষ্ট করা মোটেই সম্ভব নয়। তাই এণ্টিবায়োটিক দিয়ে সেপটিক টনসিল ভাল হবে এ যেন ভাবাই যায় না। হালফিল যারা ভুগতে শুরু করেছে তাদের অবশ্য অনেককেই এণ্টিবায়োটিক দ্বারা ভাল করা সম্ভব। আর তা সম্ভব হচ্ছে বলেই আজকাল সেপটিক টনসিলাইটিস কী টনসিলজনিত অন্যান্য অসুখ বিসুখও আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে।'

মীরাকাকীমা বললেন, 'তাহলে সৌগতের গলার ঢোল আর তাবিজগুলো এবার খুলে ফেলে দিই?'

স্বাতীকাকীমা বললেন, 'এক্ষুনি ফেলে দাও দিদি। ওর পরীক্ষাটা হয়ে গেলে আমি এবার অপারেশনটা করিয়ে নেবই।'

সৌগত তখন ওর মায়ের পাশে বসে-বসে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফিকফিক করে হাসতে লাগল।

বুকুমাসির কাণ্ড

আজ কদিন ধরেই পিপলুর ডান কানটা ব্যথা-ব্যথা করছিল। আর সেইসঙ্গে ওই কানটায়ও কিছু কমও শুনছিল।

সেদিন ছিল রবিবার। পিপলুর বুকুমাসি তাই এসেছিল ওদের বাড়ি বেড়াতে। তিনি তো পিপলুর কানে ব্যথা হচ্ছে শুনেই বললেন, 'আয় তো দেখি তোর কানটায় কী হয়েছে।' এই বলে তিনি পিপলুকে টানতে-টানতে উঠোনে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে ওর কানটা টেনে-টেনে রদ্দুরের আলোয় কী যেন দেখতে লাগলেন।

'ওকিরে বুকু, পিপলুর কান ধরে অমন টানাটানি করছিস কেন?' পিপলুর মা, মানে অপর্ণামাসি তো বুকুমাসির কাণ্ড দেখে অবাক।

'না, না, কান টানব কেন।' পিপলু কী আমাদের তেমন ছেলে যে ওকে কান টেনে শাস্তি দিতে হবে। ওযে কানে ব্যথা বলছে। ভাই দেখছি, ওর কানে কী হয়েছে।' বুকুমাসি উত্তর দিলেন।

'ওমা, তাই নাকি! কিরে পিপলু আমাকে তো বলিসনি তোর কানে ব্যথা?' অপর্ণামাসি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'সেকিরে পিপলু, এতদিন তুই মাকে জানাসনি, তোর কান-ব্যথার কথা?'

'না।'

'কেন?'

'উঃ, কান পরিষ্কার করতে মা যে কী ভীষণ কাণ্ড লাগিয়ে দেয়, তা জান না তো।'

'কান পরিষ্কার না করে দিলে, তা কী করে ভাল থাকবে শুনি?' পিপলুর কথা শুনে বুকুমাসি ধমক দিলেন। 'যাকগে, আর ভয় পেতে হবে না। আয়, এখানে চুপটি মেরে বস, তোর মায়ের চেয়ে আমি অনেক ভাল কান পরিষ্কার করতে পারি। দেখবি একদম ব্যথা পাবি না।'

'ওরে বাস্, তুমিও কী কান পরিষ্কার করবে নাকি?' বুকুমাসির কথাটা শুনেই পিপলু এক লাফে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পালাব বললেই কী পালান যায়? বুকুমাসিও অমনি দারুণ স্পিডে দৌড়ে গিয়ে পিপলুকে ফের

ধরে ফেললেন। 'কিরে, পালাচ্ছিলি যে বড় ? খুব ওস্তাদ হয়েছিস না ?' বুকুমাসি পিপলুর চুলের মুঠোটা খপ করে ধরে নেড়ে দিয়ে বললেন, 'এবার একদম চুপ করে বসে থাকবি। তা-না-হলে ঠাস করে চড়িয়ে দেব বলছি।'

বুকুমাসির কথায় ভয় পেয়ে পিপলু এবার জড়সড় হয়ে বসে পড়ল। বুকুমাসিও অমনি ওর খোঁপা থেকে একটা কাঁটা খুলে নিয়ে তাই দিয়ে পিপলুর কানটা পরিষ্কার করতে শুরু করে দিলেন।

'উঃ, কী লাগছে গো মাসি।' একটু পরেই পিপলু চেঁচিয়ে উঠল।

'চুপ কর। ভারি আদুরে হয়েছিস না ? কান থেকে একটু খোল বের করাতে একবারে কষ্টে যেন গলে যাচ্ছিস।'

বুকুমাসির ধমক খেয়ে পিপলু আবার চেষ্টা করল দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে। কিন্তু একটু পরেই হঠাৎ বুকুমাসির মাথার কাঁটাটা বেকায়দায় খোঁচা মারতেই 'বাপরে-গেছিরে' বলে পিপলু একলাফে উঠে দাঁড়াল। আর পিপলু লাফ মারতেই বুকুমাসির কাঁটাটা এমন নড়ে গেল যে সেই ধাক্কায় পিপলুর কান থেকে গলগল করে রক্ত বেরুতে শুরু করল।

এদিকে পিপলুর বাবা সেদিন সকাল থেকেই নিজের পড়ার টেবিলে বসে একটা ছড়া লিখছিলেন। উনি অবশ্য মাঝে-মাঝে বাড়ির উঠোনের দিক থেকে একটা গোলমাল শুনতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু তাতে তিনি তেমন কান দিতে চাইছিলেন না। তাছাড়া সম্পাদক মশাইকেও ওঁর কথা দেওয়া আছে, সোমবারের মধ্যে ছড়াটা দিতেই হবে। কিন্তু এবারে পিপলুর চিৎকারটা শুনে উনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। খাতাপত্তর বন্ধ করে উনি ছুটলেন উঠোনে।

উঠোনে পৌঁছেই তো অশোকবাবুর চক্ষুস্থির। 'একি কাণ্ড ! মাথার কাঁটা দিয়ে পিপলুর কান পরিষ্কার করতে কে বলল তোমাকে। পিপলুর কানে রক্ত আর বুকুমাসির হাতে মাথার কাঁটা দেখেই তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। 'বলি, এসেছ তো রবিবার দিদির বাড়ি বেড়াতে। তা ভালমন্দ দুটো খেয়ে ওবেলা বাড়ি চলে গেলেই হত। তোমাকে আবার ডাক্তারি করতে কে বলল ?' অশোকবাবু রাগে গর গর করতে লাগলেন। 'উঃ এদের জ্বালায় কী একটা দিনও শান্তিতে কাজ করতে পারব না ? চল এবার ডাক্তারখানায়।' অশোকবাবু তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে

আসতে গেলেন।

ডাক্তারবাবু তো ঘটনাটা শুনেই বুকুমাসির ওপর দারুণ রেগে উঠলেন। 'ছি, ছি, এইভাবে কেউ বাচ্চাছেলেদের কষ্ট দেয় ? তাছাড়া আপনি জানেনই বা কী যে ওর কান পরিষ্কার করতে গেলেন ? বলি কাজটা কী এতই সহজ নাকি ?' ডাক্তারবাবুকে রাগতে দেখে বুকুমাসি পিপলুর পাশে ঘাড় হেঁট করে বসে রইলেন।

'ছিঃ ছিঃ, কী কাণ্ড বলুন তো ? পিপলুর কানে ফের রক্ত বেরুচ্ছে দেখে ডাক্তারবাবু আবার চেঁচিয়ে উঠলেন। 'বাড়ির বড়রা যে মাঝে-মাঝে ছোটদের কী কষ্ট দেন, তা আর বলার নয়। তারা আবার নিজেরাও দেখি মাঝে-মাঝে সব রাস্তায় বসে কান পরিষ্কার করাচ্ছেন।'

'ঠিক বলেছেন ডাক্তারবাবু। কী করে যে মানুষের অমন রুচি হয় কে জানে।' অশোকবাবু ডাক্তার বসুকে সমর্থন করলেন।

'অথচ, জানেন তো, আজকাল প্রায় সব হাসপাতালেই কানের বিভাগ আছে, যেখানে গেলে কোন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে এক দণ্ডেই কাজটা তাঁরা করিয়ে নিতে পারেন। কানের মত একটা এত প্রয়োজনীয় অঙ্গকে কেউ যে অমন অবহেলা করতে পারে, এ যেন ভাবাই যায় না।' ডাক্তারবাবু রাগতভাবে উঠে গিয়ে এবার পিপলুকে নিয়ে গিয়ে বসলেন একটা চেয়ারে। তারপর তিনি তার মাথায় একটা গোল আয়নার মতন যন্ত্র বেঁধে, সেটা দিয়ে পিপলুর কানটায় আলো ফেলেই চেঁচিয়ে উঠলেন। 'ইস, ছেলেটার কানে ময়লা ছিল কী ছিল না তার ঠিক নেই, আর তা বার করতে আপনি ওর কানটার এমন ক্ষতি করলেন ?'

'সেকি, পিপলুর কানে কী, তার মানে, ময়লা মোটে ছিলই না ?' অশোকবাবু এবার খুব অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'তাইতো দেখছি। আসলে কানে কোন কষ্ট হলেই, সবাই ভাবে তার কানে বুঝি খোল হয়েছে। ময়লা কী খোল ছাড়াও যে কানে আরও অনেক কারণেই কষ্ট হতে পারে সে যেন তারা ভাবতেই পারে না। আর সে তোমরা পার-না-পার আপত্তি নেই, কিন্তু বলি কী হয়েছে তা জানতে একবার ডাক্তারের কাছে যাও না কেন ? তা নয়, অমনি তারা সব বসে যাবে হাতের কাছে যা পাবে তাই দিয়ে কান পরিষ্কার করতে।' ডাক্তারবাবু গজগজ করতে-করতে একটা ফরসেপস-এ তুলো নিয়ে পিপলুর কানের

ভিতরটা ভাল করে দেখে বললেন, 'যাক, এযাত্রা দেখছি ছেলেটা খুব বেঁচে গেছে।'

'তার মানে ?' অশোকবাবু মনে হয় ডাঃ বসুর কথার মানেটা ঠিক বুঝতে পারলেন না।

'মানে আঘাত দেখছি কানের পর্দা অবধি পৌঁছয়নি। শুধু বাইরের কানের চামড়াটা ছিড়ে গেছে।'

'কান পরিষ্কার করতে গেলে পর্দাতেও আঘাত লাগে নাকি ?'

'নিশ্চয়। ওই যারা সব রাস্তায় কান পরিষ্কার করাতে যায়, তাদের অনেককেই তো ফের ছুটতে হয় কানের পর্দার ফুটো সারাতে।'

'তাই নাকি !'

'হ্যাঁ। আর তাদের অধিকাংশকেই কষ্ট পেতে হয় কানের ঘা কী ফোঁড়া নিয়ে।'

'বলেন কী !'

'এতে আর অত আশ্চর্য হবার কী আছে। বাইরের কান বা যাকে বলে শ্রুতি সুড়ঙ্গ, সেখানে তো সদাই উপস্থিত থাকে নানান জীবাণু। তাই কান খুঁচিয়ে চামড়ায় ঘা করলে, সেই জীবাণুরা তো তখন কানের চামড়ার ভেতরে ঢুকবেই। আর সেখানে পৌঁছে, তার প্রদাহ ঘটায় কানের মধ্যে যে সব চুলগুলি থাকে, তাদের গোড়ায়। আর তার ফলেই তখন সৃষ্টি হয় ফোঁড়ার। যা খুবই বেদনাদায়ক এবং মারাত্মকও বটে। দাঁড়ান, আর কথা না বাড়িয়ে আগে ছেলেটার কানে যেটুকু ময়লা আছে, সেটা বের করে দিই।' এই বলে ডাক্তারবাবু পিপলুর কানে কয়েক ফোঁটা ওষুধ ঢেলে দিলেন।

'ওটা কী ওষুধ দিলেন ডাক্তারবাবু ?'

'সেরুক্লিন। এ ওষুধটার কাজ হল কানের খোলকে নরম করা। এরকম আরও অনেক ওষুধ আছে। যেমন হাইজিনা কী অরিসটিলি ইয়ার ড্রপ।'

'এর পর কী করবেন ?'

ওই ওষুধটাই পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর আরও দুতিনবার ওর কানে দেব। তারপর একটা পিচকিরিতে অল্প গরম জল ভরে নিয়ে তাই দিয়ে ওর কানটা ধুয়ে দেব। যখন নরম খোলের ঢেলাটা চট্ করে বেরিয়ে

আসবে। ও মোটে তা জানতেই পারবে না।'

'বলেন কী, কানের খোল পরিষ্কার করা এতই সহজ ?'

'হ্যাঁ এতই সহজ। তবে অবশ্য সামান্য কিছু রোগী আছে, যাদের খোল একবারে নাও বেরতে পারে। সেরকম বেশি খোল দেখলে আমরা তাকে কদিন পর পর ওষুধটা দিয়ে তারপর আসতে বলি। আর কখনও এমন সব রোগী আসে যাদের খোল বার করতে অজ্ঞান করারও প্রয়োজন হয়।

'তার মানে ?'

তার মানে, আমরা যখন বুঝতে পারি রোগীর খোল হাজার পিচকিরি মারলেও বেরবার নয়, অথবা যখন দেখি সে হয়তো এসেছে যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে, যখন পিচকিরি সহ্য করা তার দ্বারা মোটেই সম্ভব নয়, তখন তাকে আমরা চাই অজ্ঞান করে কোন যন্ত্রের সাহায্যে তার খোলটা বার করে দিতে।'

'কিন্তু অজ্ঞান না করেও তো যন্ত্র দিয়ে খুঁটে খোলটা বার করে দিতে পারেন ?' অশোকবাবু চেয়ারটা টেনে বসলেন।

ডাক্তারবাবু আবার উঠে গিয়ে পিপলুর কানে কফোঁটা ওষুধ ফেলতে ফেলতে বললেন, 'না, তা কখনই করা উচিত নয়। কারণ তাতে সে রোগীটা মরে পর্যন্ত যেতে পারে।'

'সে কী ! খোল বার করতে গিয়ে রোগী মরে যাবে ?'

'হ্যাঁ। কারণ, আপনারা হয়ত জানেন না, কান আর হার্টে থাকে একই স্নায়ু—যার নাম, 'ভেগাসনার্ভ', যাকে উত্তেজিত করলে হার্টের স্পন্দন থেমে যেতে পারে। তাই কানের কোন যন্ত্রণাদায়ক রোগের চিকিৎসা করতে চাইলেই, আমরা তাকে অজ্ঞান করে নিই—যা খুবই সহজ এবং রোগীর পক্ষেও নিরাপদ।

'আশ্চর্য, এতকথা তো আমরা কিছুই জানতাম না।'

'কেন আপনারা কী শোনেন নি, কানে জোর আঘাত পেলে কী জোর কোন শব্দ শুনলে রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় ?'

'তা কেন শুনব না ?'

'সেটাও তো হয় ওই একই কারণে।'

ডাক্তারবাবু এবার পিচকিরি দিয়ে পিপলুর কানটা ধুয়ে দিলেন। অশোকবাবু লক্ষ্য করলেন, পিপলুর কান থেকে সামান্য একটু ময়লা

বেরিয়ে এল।

'আর ময়লা নেই ?'

'না।'

'ওইটুকু ময়লা বার করতে তখন অত রক্ত বেরুল ?'

'সেটাতো তো বেরুল ওর কানের চামড়াটা ছিড়ে।'

'সেটা তাহলে কী করে সারবে ?'

'সেটা সারাতে যে কোন রকমের এন্টিবায়োটিক ক্রিম একটা গজে লাগিয়ে, সেটা ওর কানের মধ্যে ভরে দেব। এইভাবেই মাঝে-মাঝেই ওর কানটাকে এখন কদিন ড্রেস করতে হবে। সেই সঙ্গে কিছু এন্টিবায়োটিক ওষুধ খেতেও হবে। তা নাহলে ওর কানের ঘা-টা সারবে না।'

'তার মানে কানটাকে ওর মাসি অমন করে খুঁচিয়ে পরিষ্কার করতে না চাইলে পিপলুর এত কষ্টও হত না, আর ওকে অত ওষুধও খেতে হত না ?' অশোকবাবু প্রশ্ন করলেন। ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বললেন, 'হ্যাঁ।'

'ইস, তোমরা যে কী কর।' অশোকবাবু বুকুমাসিকে ফের মৃদু ধমক লাগালেন।

'এ কাজ কী ভাবছেন উনি একলাই করেছেন ? রোজই যে এইরকম কত ঘটনা ঘটছে তার আর ইয়ত্তা নেই।'

'আচ্ছা ডাক্তারবাবু মানুষের কানে খোল হয় কেন সেকথাটা তো জানলুম না।'

'কানের ময়লাকে ডাক্তারী ভাষায় বলা হয় 'সেরুমেন' বা ওয়াক্স। শ্রুতিসুড়ঙ্গে চামড়ার নিচে দু প্রকার গ্রন্থি থাকে। এক, 'সিবেসান গ্রন্থি'—যার থেকে নিঃসৃত হয় তেল জাতীয় রস, আর দুই, 'সেরুমিনাস গ্রন্থি'—যার রস হল জলীয়। এই সেরুমিনাস গ্রন্থির অস্বাভাবিক বেশি পরিমাণ ক্ষরণ হলে তা জমে উঠে কানে খোলের সৃষ্টি হয়।'

'তার মানে, কানের খোল, বাইরের ধুলো বালি ঢুকে সৃষ্টি হয় না ?' অশোকবাবু প্রশ্ন করলেন।

'অল্পসল্প ধুলো বালি, যা রোজই আমাদের কানে ঢুকছে, তা কান নিজেই বার করে দিতে পারে। খুব বেশি ধুলো বালি ঢুকলে তা অবশ্য কানের ওইসব গ্রন্থিরসের সঙ্গে মিশে খোল সৃষ্টি করতে পারে। আর

সেইজন্যেই যারা সুরকি, কয়লা, সিমেন্ট ইত্যাদির মত কোন কলকারখানায় কাজ করেন তাদের মাঝে মাঝেই কানে খোল হয়। এসব ছাড়াও অবশ্য আরও অনেক কারণেই কানে খোল হতে পারে। যেমন ধরুন, যাদের কানের চামড়ায় মেয়াদী প্রদাহ থাকে, মাথায় যাদের বেশি খুসকি হয়, যারা নিত্য কানে তোয়ালে, গামছা কী পালক ঢোকায়...'

'সেকি ! তোয়ালে কী গামছা ঢোকালেও কানে খোল সৃষ্টি হতে পারে ?'

'হ্যাঁ। কারণ রোজ কানে কাপড় ঢোকালে তাদের দু-এক টুকরো সুতো কানে ঢুকে থাকতে পারে। যার চারদিকে গ্রন্থীরস জমে খোলের সৃষ্টি হয়।'

'কিন্তু ডাক্তারবাবু, আপনি যে বললেন কানের চামড়ায় মেয়াদী প্রদাহ থাকলেও খোল হতে পারে ? কিন্তু মেয়াদী-প্রদাহ কেন হয় সেটা তো বললেন না ?'

'মেয়াদী-প্রদাহ বা ক্রনিক ডারমাটাইটিস হয় কান খোঁচালে, ময়লা জলে ডুবে স্নান করলে, কানের মধ্যে দীর্ঘকাল কোন অবাঞ্ছিত বস্তু পড়ে থাকলে, অযথা কানের মধ্যে এন্টিবায়োটিক ওষুধ প্রয়োগ করলে, মাথার খুসকির চিকিৎসা না করালে ইত্যাদি নানান কারণে।'

'ও, তাহলে কান দেখছি বাইরের কোন হস্তক্ষেপই পছন্দ করে না। কান খোঁচানো চলবে না, অযথা ওষুধ দেওয়া চলবে না।'...

'ঠিকই বলেছেন। আসলে কান স্বাভাবিক ভাবে পরিষ্কার থাকাই নিয়ম। তাই তাকে অযথা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে নেই। আর কানে কোন কষ্ট হলে, নিজেরা ওস্তাদি না করে তা কোন বিশেষজ্ঞর দ্বারাই যাচাই করে নেওয়া উচিত।'

'কী ডাক্তারবাবুর কথাগুলো কানে ঢুকছে তো ?' অশোকবাবু আবার একবার চোখ পাকিয়ে বকুমাসির দিকে তাকালেন।

'এবার থেকে বিশেষজ্ঞদের কাজ বিশেষজ্ঞদের করতে দিও—বুঝলে।'

লীলাকাকীমার অপারেশন

'কী ব্যাপার, এই সাত-সকালে আপনারা চললেন কোথায় ?' অসীমবাবু

আর লীলাদেবীকে ভোরবেলা ট্রামে উঠতে দেখে গোপালবাবু একটু অবাক হলেন।

'আর বলেন কেন। কাল ছেলেটা ফের একটা ঝঞ্ঝাট বাধিয়েছে।' অসীমবাবু ট্রামে উঠতে-উঠতে উত্তর দিলেন।

'ছেলেটা—মানে অর্ণব ?'

'ও ছাড়া আর আমাদের ছেলে কই ?' পাশ থেকে লীলাদেবী উত্তর দিলেন।

'কিন্তু ব্যাপারটা কী ?'

'আর বলেন কেন। আমি তো তখন অফিসে। কাল ছেলেমেয়েদের স্কুল ছুটি ছিল। তাই ভেবেছিলুম, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে কাল অর্ণব আর অর্পিতাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাব।'

'তারপর ? তারপর ?'—গোপালবাবু এগিয়ে দাঁড়ালেন।

'এই যে এবার বেড়াতে যাচ্ছি।'

'কোথায় ?'

'কোথায় আবার হাসপাতালে।'

'হাসপাতালে ! কেন ?'

'আর কেন। অর্ণব কাল দুপুরে হঠাৎ কানের মধ্যে একটা পুঁতি ঢুকিয়ে ফেলেছিল।'

'বলেন কী !'

'হ্যাঁ। আর ওস্তাদি করে সেটা বার করার চেষ্টা করেছিলেন ওর এই মা আর দিদি।'

'তারপর ?'

'তারপর যা হবার ঠিক তাই-ই হয়েছে। সেটা শুনছি নাকি এখন কানের অনেক ভেতরে ঢুকে গেছে।'

'মানে ? ব্যাপারটা একটু খুলেই বলুন না মশাই।' গোপালবাবু মনে হল অসীমবাবুর অমন হেঁয়ালী করে কথা বলা পছন্দ করলেন না।

'বললুম তো, এদের জ্বালায় আর টিকতে পারছি না। ভাবছি এবার কোথাও পালিয়ে যাব। অর্ণব না হয় বাচ্চাছেলে যা-হোক একটা কিছু ঘটিয়েছিল। কিন্তু তা বলে তোমরা কেন অমন ওস্তাদি করতে গেলে ?' অসীমবাবু খুব বিরক্ত হয়ে কথাগুলো বললেন।

'ঠিক-ঠিক। এই তো কদিন আগে আমার ভাগ্নী...'

'মানে সোনালী ?'

'হ্যাঁ-সোনালী। ওর কানে একটা জ্যান্ত আরশোলার বাচ্চা ঢুকে গেছল।'

'বলেন কী !'

'হ্যাঁ। তখন আবার ছিল লোডশেডিং।'

'তারপর ?'

'তারপর সে মেয়ে তখন দারুন লাফালাফি শুরু করে দিয়েছিল। তা ওর মার তো উপস্থিত বুদ্ধি খুবই প্রখর। সে করেছিল কী, তক্ষুনি সোনালীর কানে তেল না গ্লিসারিন, কী জানি কী একটা ঢেলে দিয়েছিল। আর তাতেই পোকাটা তক্ষুনি মরে যায়। ফলে সোনালীর কানের সড়সড়ানিটা কমে গেলেও আবার ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন অবশ্য ভোর হতেই ওরা ওকে নিয়ে গেছল হাসপাতালে। সেখানে শুনলুম, ডাক্তারবাবু কানটা পিচকিরি দিয়ে ধুয়ে দিতেই আরশোলাটা বেরিয়ে এসেছিল। ডাক্তারবাবু নাকি সোনালীর মায়ের উপস্থিত বুদ্ধিরও খুব প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন, ওনারাও নাকি কারও কানে জ্যান্ত কোন পোকামাকড় ঢুকে গেলে তা অমনি ভাবেই কোন তেল কী গ্লিসারিন ঢেলে দিয়ে পোকাটাকে প্রথমে মেরে ফেলেন। তারপর সেটাকে তারা বার করে আনেন পিচকিরি দিয়ে ধুয়ে অথবা কোন ফরসেপ্সয়ের সাহায্যে।'

'শুনলে তো ?' অসীমবাবু এবার লীলাদেবীর দিকে কড়া চোখে তাকালেন। কই সোনালীর মা তো তোমাদের মত আঁকপাঁক করে পোকাটাকে বার করে আনতে সোনালীর কানে যাহোক তাহোক কিছু ঢুকিয়ে দেননি !'

'যাকগে, সে যা হবার তা তো হয়েইছিল। এখন অর্ণবের ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন তো।'

'আরে বললুম তো...আমি তো তখন অফিসে।' অসীমবাবু আবার শুরু করলেন। অর্ণব হঠাৎ কাল দুপুরে ওর কানে একটা পুঁতি ঢুকিয়ে ফেলে। আর তাই শুনেই তো ওর মা আর দিদি সঙ্গে-সঙ্গে অর্ণবের কানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুনলাম, অর্পিতা নাকি টর্চ ফেলতেই দেখতে পায়, পুঁতিটা চকচক করছে। আর যায় কোথায়। সেটাকে তখন বার করার জন্যে ওর

মা মরিয়া হয়ে ওঠেন। মাথার কাঁটা, দাঁতের কাঠি, নরুণ, হাতের কাছে যা ছিল তাই দিয়েই তিনি তখন ওই পুঁতিটাকে বার করে আনার চেষ্টা করতে থাকেন। শেষে যখন ওসবের কোনটা দিয়েই পুঁতিটা বেরল না, তখন তিনি ওর কানের মধ্যে একটা ক্রুশকাঠিকে ঢুকিয়ে দেন।'

'তা অর্ণব ওর কানে অত কিছু সব ঢোকাতে দিল ?' গোপাল বাবু দারুণ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'সে কী এমনি দিয়েছে নাকি ? ওর মা আর দিদির চেঁচামেচিতে তো তখন আশপাশের ফ্ল্যাট থেকেও সব এসে পড়েছেন। তারাই অর্ণবকে খাটের ওপর ফেলে চেপে ধরেছিল। অর্পিতা শুনলাম টর্চ ধরেছিল। আর ওর মা, মানে ইনি দি গ্রেট সার্জেন, তখন ওর কানে অপারেশন করছিলেন।'

'আঃ, কী যা-তা বকছ ?' লীলাদেবী এবার অসীমবাবুর কথার দারুণ প্রতিবাদ করলেন।

'যা-তা মানে ?'

'যা তা নয়ত কী।' দেখলাম কানের সামনে পুঁতিটা দেখা যাচ্ছে তাই ভাবলাম...'

'অপারেশনটা করেই দিই।' গোপালবাবু টিপ্পনী কাটলেন।

'দুস্, তোমরা দেখছি কেউই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে চাইছ না।' লীলাদেবী আপসোস করলেন।

'তা কী আর বুঝতে চাইছি। এবার চল না হাসপাতালে ডাক্তারবাবুও তোমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন।'

'তারপর কী হল ?' গোপালবাবু আবার প্রশ্ন করলেন।

'তারপর তো সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। পুঁতিটা তো বেরলই না। মাঝখান থেকে ক্রুশের ধাক্কায় সেটা গেল চলে কানের ভেতরে। আর তখন শুরু হল অর্ণবের চিৎকার। শেষে উনি আর হালে পানি না পেয়ে আমাকে অফিসে ফোন করেছিলেন। আমি তো মশাই বাড়ি ফিরে ওই দৃশ্য দেখেই হাঁ।'

'বলেন কী ! তারপর ?'

'আমি তখন আর এক মিনিটও দেরি না করে ওকে নিয়ে দৌড়লুম হাসপাতালে। সেখানে ইমারজেন্সির ডাক্তারবাবু কেসটা শুনেই ওকে ভর্তি

করে নিলেন। একটু পরেই এলেন ডাক্তার জয়ন্ত চৌধুরী ! কানের ডিপার্টমেণ্টের আর এস। তিনি অর্ণবকে পরীক্ষা করে বললেন, 'এতো মনে হচ্ছে অপারেশন লাগবে। উনিই আজ সকাল আটটায় আমাদের দেখা করতে বলেছেন।' ট্রামটা থামতেই গোপালবাবু ধড়মড় করে নেমে গেলেন। রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় দেখা করছি। প্রয়োজন হলে অফিসে ফোন করবেন কেমন।'

হাসপাতালে পৌঁছেই অসীমবাবু দেখলেন ডাঃ চৌধুরী তখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছেন। অসীমবাবু সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই, ডাঃ চৌধুরী বললেন, 'যাক, আপনারা এসে গেছেন। ভালই হয়েছে। একটু পরেই ছেলেটাকে অপারেশন ঘরে নিয়ে যাব। আজ সকালে আমাদের ভিজিটিং সার্জেনও আপনার ছেলেটাকে দেখছেন। উনিও বলেছেন, অপারেশন ছাড়া পুঁতিটাকে বার করা সম্ভব নয়।'

'সত্যিই তাহলে অপারেশনই লাগবে ?' অসীমবাবুর গলাটা কেমন যেন করুণ শোনাল।

'আহা, অপারেশনের নাম শুনে অমন ভেঙে পড়লেন কেন ?' ডাঃ চৌধুরী অসীমবাবুকে সাহস দিতে চাইলেন। বললেন, 'যান, আপনারা বরং ওই বেঞ্চটাতে গিয়ে বসুন।'

'ডাক্তারবাবু একটা অনুরোধ করব।' এবার লীলাদেবী এগিয়ে গিয়ে ডাঃ চৌধুরীর পথ আগলে দাঁড়ালেন।

'কী অনুরোধ ?'

'দয়া করে আপনিই অর্ণবের অপারেশনটা করুন। কাল থেকে আপনিই তো ওকে দেখছেন।' তাছাড়া লীলাদেবী আরও কিছু হয়ত বলতেন। কিন্তু তার আগেই কান্নায় ওর গলাটা জড়িয়ে গেল। উনি আর কথা বলতে পারলেন না।

'ঠিক আছে -ঠিক আছে। এ আর বলার কী আছে। হাসপাতালের যত ইমারজেন্সী অপারেশন, সবই তো আর এসরাই করেন। আপনি তাই না বললেও আমিও ওর অপারেশনটা করতাম।' ডাঃ চৌধুরী লীলাদেবীকে আশ্বস্ত করে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকে পড়লেন।

কিন্তু একি ! অসীমবাবু নিজের হাতঘড়িটার দিকে বার-বার তাকাতে

লাগলেন। ঘণ্টাখানেক প্রায় পার হল, ডাক্তারবাবু তো কোন খবর পাঠালেন না ! কান থেকে একটা পুঁতি বার করতে এত সময় লাগছে কেন ? অসীমবাবু আর স্থির থাকতে পারলেন না। বেঞ্চ থেকে উঠে বারান্দায় পায়চারি শুরু করে দিলেন। তারপর প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের মাথায় অসীমবাবু দেখলেন, ডাঃ চৌধুরী অপারেশন থিয়েটারের বাইরে এসে কাকে যেন খুঁজছেন।

'ডাক্তারবাবু এত দেরি হল ?' অসীমবাবু তো ডাঃ চৌধুরীকে দেখতে পেয়েই দৌড়ে গেলেন।

'দেরি হবে না। পুঁতিটাকে বার করতে যে ওর ম্যাসটয়েড হাড় কাটতে হল।'

'সেকি !'

'হ্যাঁ, পুঁতিটা কানের পর্দা ফুটো করে এতই ভেতরে ঢুকে গেছল যে কানের মধ্যে দিয়ে সেটাকে মোটে বার করাই গেল না।'

'বলেন কী ! তার মানে, পুঁতিটা কী...'

'হ্যাঁ, ওটা কানের পর্দা ফাটিয়ে মাঝের কানের মধ্যে ঢুকে গেছল। তাই ওটা বার করে আনতে ওর কানের পেছনের ম্যাসটয়েড হাড় কাটতে হল।' ডাঃ চৌধুরি বেশ ক্লান্ত সুরে উত্তর দিলেন।

'কিন্তু, অর্ণব কেমন আছে ?'

'ভাল।'

'এত দেরি হচ্ছে দেখে আমরা সত্যিই খুব চিন্তায় ছিলুম। আচ্ছা, অর্নব আবার ওই কানটাতে আগের মত শুনতে পাবে তো ?'

'সত্যি, সেটা ভাবতেই ভারি কষ্ট হচ্ছে। লক্ষ্য করলাম, পুঁতি আর ওই ক্রুশটুশয়ের ধাক্কায়, মাঝের কানের মধ্যে সারিবদ্ধভাবে যে সব কনাস্থিগুলো থাকে, যার ভেতর দিয়ে বাইরের শব্দ ভেতরের কানে প্রবেশ করে, তারা সব ভেঙে গিয়ে, নড়েচড়ে গেছে। তাছাড়া কানের পর্দাটাও দেখলাম বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাই এক্ষুনি অর্নব ওই কানটাতে আর আগের মত শুনতে পাবে না। ডাঃ চৌধুরী বেশ গম্ভীর হয়ে কথাগুলো বললেন।

'তাহলে কী অর্ণব ওই কানটায় আর কোনদিনই তেমন শুনতে পাবে না ?'—লীলাদেবী ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করলেন।

'পাবে, তবে তার জন্যে এখন অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। আসলে আধুনিক শল্যচিকিৎসায় কানের পর্দা কী কর্নাস্থি সবই গড়া যায়—কিন্তু তাতে অনেক সময় লাগে। এবং সব সময়েই যে তা কানকে আবার ষোলআনা স্বাভাবিক করে তুলতে পারে—তাও আশা করা কঠিন।'

'ইস্ কী থেকে কী হয়ে গেল বলুন তো।' অসীমবাবু মনে হল হতাশায় ভেঙে পড়লেন।

'এই জন্যেই তো আমরা বলি, বাচ্চাদের হাতের নাগালে এমন কিছুই রাখবেন না যা তারা মুখে কানে কী নাকে ঢুকিয়ে ফেলে কোন বিপদ ঘটাতে পারে। আর কখনও যদি হঠাৎ ওই জাতীয় কোন বিপদ ঘটেই যায় তাহলে নিজেরা কোনরকম চেষ্টা না করে সেটাকে নিরাপদে বার করে আনতে কোন হাসপাতালে কী বিশেষজ্ঞের কাছে যাবেন। শ্রুতিসুড়ঙ্গ বা বহিঃকর্ণের দৈর্ঘ্য হল মাত্র এক ইঞ্চি। তার ভেতরে অত লম্বা-লম্বা কিছু ঢোকালে তাদের ধাক্কায় কানের পর্দা তো ফেটে যাবেই।' ডাঃ চৌধুরী আর কথা না বাড়িয়ে আবার অপারেশন থিয়েটারে ঢুকে পড়লেন।

গোপালবাবু সেদিন রাত্রে ফের গেলেন অসীমবাবুর বাড়ি—অর্ণবের খবর নিতে।

'আসুন।' গোপালবাবুকে দেখেই লীলাদেবী চেয়ারটা এগিয়ে দিলেন।

'অপারেশন হল ?' গোপালবাবু চেয়ারে বসতে-বসতে প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ অপারেশন হয়েছে, পুঁতিটাও বেরিয়েছে, কিন্তু অর্ণব ওই কানটায় আর ভালো শুনতে পাবে না হয়তো।

অসীমবাবুকে চশমা খুলে চোখ মুছতে দেখে গোপালবাবুরও চশমার কাঁচটা কেমন ঝাপসা হয়ে উঠল।

জগার ছেলের কানে পুঁজ

'বড়দা, জগার ছেলেটাকে শুনলাম নাকি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে ?' বিমলবাবু চেয়ারটা টেনে বসলেন।

'হ্যাঁরে।' ডাঃ কৃষ্ণকিশোর চ্যাটার্জি খুব চিন্তিতভাবে উত্তর দিলেন।

'কিন্তু ওর হয়েছিলটা কী ?'

'আজ কদিন ধরেই ওর মাথাব্যথা আর জ্বর চলছিল। কাল হঠাৎ ওর হাত-পায়ে খিচুনি শুরু হয়। আর তার একটু পরেই ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মনে হয়, ওর মেনিনজাইটিস হয়েছে।'

'সেকি ? সে তো শুনেছি খুব সাংঘাতিক অসুখ।' বিমলবাবু এগিয়ে বসলেন। 'তাহলে এখন কী হবে ?'

'হবে আর কী। কদিনের মধ্যেই মনে হয় ও ফের সেরে উঠবে।'

'যাক্ আপনি যখন ভরসা দিচ্ছেন, তখন আর ভয় নেই।' বিমলবাবু ডাঃ চ্যাটার্জির কথায় আশ্বস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'অফিস থেকে ফিরেই জগার ছেলেটার অসুখ শুনে ঘাবড়ে গেসলুম। তাই ভাবলুম, বড়দার মুখ থেকেই খবরটা শুনে আসি।' ইছাপুরের ছেলে-বুড়ো ডাঃ চ্যাটার্জিকে সব বড়দা বলেই ডাকেন। 'কিন্তু জগার ছেলেটাকে দেখে তো মনে হত না যে ওর ভেতরে তেমন কোন অসুখ আছে ?' বিমলবাবু ফের বসলেন।

'না না, ও তো সে রকম কোন রোগে ভুগছিল না, যা বাইরে থেকে বোঝা যাবে। ও ছোট থেকেই ভুগছিল কানের পুঁজে।

'সেই পুঁজ থেকেই কী এবার মেনিনজাইটিস হল নাকি ?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। দেখি আজ এক্সরেতে কী বেরয়।'

'ওর কী আবার এক্সরেও করা হয়েছিল নাকি ?'

'হ্যাঁ, আজ কদিন ধরেই তো ওর কানের পুঁজটা বেড়ে গিয়েছিল। সেইসঙ্গে ও আবার মাথায় খুব যন্ত্রণাও বোধ করছিল। তাই গত পরশু প্যাঠিয়েছিলুম ওকে, কানের হাড়ের এক্সরে করতে।'

'তা এতদিন কী জগা ওর ছেলের কোন চিকিৎসাই করায়নি ?' বিমলবাবু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'করাচ্ছিল, তবে সে সবই টোটকা-চিকিৎসা'।

'এ্যাঁ, সেকি !' বিমলবাবু আঁতকে উঠলেন। 'আপনি থাকতে জগা ওর ছেলেকে করাচ্ছিল টোটকা-চিকিৎসা ?'

'শুধু জগা কেন ? খোঁজ নিলেই জানতে পারবে কানের পুঁজের জন্যে আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই প্রথমে ওইরকম সব টোটকা-চিকিৎসাই করায়।'

'তা অবশ্য ঠিক। আমাদের দেশ-গাঁয় তো শুনি, প্রায় প্রতি ঘরেই কেউ-না-কেউ কানের পুঁজে ভোগে। আর তারাসব...'

'ঠিক বলেছো। এ কথাটা তারা মোটে বুঝতেই শিখল না যে কানের পুঁজ একটা মারাত্মক অসুখ। তাই তাদের কারও কানে পুঁজ হলে তা মোটে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চায় না।' ডাঃ চাটার্জি দুঃখ করলেন।

'কিন্তু কেন বলুন তো?'

'কেন আবার। মেয়াদী পুঁজ যুক্ত কানে না থাকে কোন ব্যথা-যন্ত্রণা, না জ্বর-জ্বালা কী অন্য কোন কষ্ট। তাই তারা তা অমন অবহেলা করতে সাহস পায়।'

'কিন্তু কানে পুঁজ হলে তো শুনি, কানে শোনাও কমে যায়, সেটাও কী তাদের সারাতে ইচ্ছে করে না?'

'না। কারণ কান যে আমাদের একজোড়া। আর সব সময় তো আর সবার দুটো কানেই পুঁজ হয় না। তাই শোনাটা এক কানে কমে গেলেও, তা তারা তাদের অন্য ভাল কানটা দিয়ে সেরে নেয়। ফলে শোনার কষ্টের জন্যেও তাদের অধিকাংশেরই আর ডাক্তারের কাছে যেতে আগ্রহ থাকে না। তাছাড়া...'

'তাছাড়া আর কী?'

'তাছাড়া কানের পুঁজ নিয়ে যেহেতু গাঁয়ের লোকই বেশি ভোগে সেহেতু ওই রোগটাকে কেন্দ্র করে সেখানে হাজার রকম সব টোটকা-চিকিৎসাও গজিয়ে উঠেছে, লোকে প্রথমেই তাই যায় সেইসব চিকিৎসা নিতে।

'ঠিক বলেছেন। পুঁজ সারাতে কেউ শুনি কানে রসুন তেল ঢালছে, কেউ ঢালছে গেঁড়ি-গুগলির তেল, কী কানচটা তেল, কেউবা কিনে আনছে বাজার থেকে যা খুশি কোন কানের ওষুধ।'

আচ্ছা বড়দা, কানের পুঁজ কী সত্যই জীবনের পক্ষে খুব হানিকর?' বিমলবাবু প্রশ্ন করলেন।

'নিশ্চয়।'

'কিন্তু আমাদের গ্রামে-গঞ্জের এত যে মানুষজন সব কানের পুঁজে ভোগে, কই তাদের তো কাউকে জগার ছেলের মত এমন বিপদে পড়তে দেখি না?'



পানাপুকুরের জল কানের পক্ষে ক্ষতিকর।

'সেটা দেখতে চাইলে তোমাকে যেতে হবে কলকাতার কোন বড় হাসপাতালে। যেখানে কানের রোগীদের জন্য আলাদা বিভাগ আছে।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। সেখানে গেলে দেখবে কানের পুঁজ এবং ওই রোগজনিত বিপদ নিয়ে যত রোগী ভর্তি আছে, তাদের অধিকাংশই হল গ্রামের লোক।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। কারণ গ্রামের লোকরাই যে স্নান করতে প্রায় বাধ্যই হন পানাপুকুরে। সেই নোংরা জল ঢুকেই তো তাদের কানে অসুখ হয় (ছবি-৩)। যখন তারা আবার পায় না তাদের হাতের কাছে কোন কানের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে সেই সঙ্গে তাদের অধিকাংশই আবার জানেও না যে ওই রোগটি কত মারাত্মক। ফলে টোটকা-চিকিৎসা নিতে তাদের বিবেকেও তেমন বাধে না।'

'তা তারা তো হাসপাতালে গেলেই পারেন ? সব গ্রামেই শুনি এখন হাসপাতাল হয়েছে।'

'হাসপাতাল হয়েছে ঠিকই। তবে সে সব ছোটখাট হাসপাতালে এখনও তো কানের চিকিৎসা কী এক্সরে ইত্যাদির ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।'

'ও তার মানে ও রোগের চিকিৎসা করাতে চাইলে তাদের যেতে হবে সেই সদর কী সহরের হাসপাতালেই ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু একজন গরীব মানুষের পক্ষে কী কাজ ফেলে, নিজের রুজিরোজগার বন্ধ রেখে, প্রচুর খরচা করে রোজ সদর কী সহরের হাসপাতালে দৌড়ন সম্ভব ?'

'ঠিক ঠিক। বিশেষ করে যে রোগে আবার তেমন কষ্ট থাকে না।'

'তাছাড়া মাত্র একবার সেখানে গিয়ে দেখিয়ে এলেই যে রোগটা সেরে যাবে, এমনও নয়। এ রোগ সারাতে অনেকেরই প্রয়োজন হয় বারবার যাতায়াত করার। বিশেষ করে যাদের আবার ভর্তি কী অপারেশনের প্রয়োজন হয়।'

'কিন্তু জগার ছেলেটা তো বেশ চট্ করে বেড পেয়ে গেল ?'

'সে তো ওর মেননজাইটিসয়ের মত বিপদ ঘটে গেছে বলে।' ডাঃ চ্যাটার্জি চেঁচিয়ে উঠলেন।

'আচ্ছা বড়দা, কানের পুঁজ থেকে রক্ষা পাওয়ার কী কোন সহজ উপায়

আছে ?'

'কেন থাকবে না। গ্রামের লোকেদের মধ্যে স্বাস্থ্যচেতনা বাড়াতে পারলেই দেখবে অনেকেরই আর ওই রোগটা হচ্ছে না। আর যাদের হয়েছে, তারাও তখন দেখবে সাবধান হয়ে যাচ্ছে। সময়ে চিকিৎসা করাচ্ছে।'

'কিন্তু চিকিৎসা পেতে তো আবার সেই ঝামেলা...'

'না না, শুধু স্বাস্থ্যচেতনা বাড়লেই চলবে না। সেইসঙ্গে তোমাদের তাদের জন্যে কিছু চিকিৎসারও ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কিন্তু কী করে এসব সম্ভব করা যায় বলুন তো ?'

এর জন্যে গ্রামে-গঞ্জের হাসপাতাল কী অন্য নানান জায়গায় পোস্টার দেওয়া যেতে পারে—যাতে লিখে কী ছবি এঁকে বোঝান থাকবে, কানের অসুখ এবং তার প্রতিকারের উপায়গুলি। মাঝে মাঝে বিশেষজ্ঞদের আনিয়ে তাদের কান-পরীক্ষা করিয়ে দেওয়াও যেতে পারে। যাঁদের উপদেশে অনেকেই সময়ে সাবধান হতে পারবে। জানতে পারবে, তাদের মধ্যেকার কার তেমন বিশেষ কোন চিকিৎসা কী অপারেশনের জরুরী আছে।'

'বুঝেছি, বুঝেছি।' বিমলবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন। 'যেমন ওই টিবি কুষ্ঠ কী অন্ধত্ব নিবারণের জন্যে করা হয়। কিন্তু কানের পুঁজের জন্যে অতসব করলে লোকে বাড়াবাড়ি ভাববে না তো ?'

'সে কী ! আসলে আমার মনে হয় তুমিও ঠিক জান না, কানের পুঁজ কত মারাত্মক অসুখ তাই তুমি অমন ভাবছ।'

'ঠিক ধরেছেন বড়দা। তবে আপনি যদি একটু বুঝিয়ে বলেন—'

'বেশ, তবে শোন। এ কথাটা নিশ্চয় বোঝ, দীর্ঘকাল কারও কানে পুঁজ থাকলে সে কালা হয়ে যায় ?'

'খুব-খুব।'

'আর সেই পুঁজ চিকিৎসার দ্বারা বন্ধ করা গেলেও, তার কম-শোনার সমস্যাটা মেটান আর সম্ভব নাও হতে পারে ?'

'কেন ? আজকাল যে শুনি অপারেশন করে কানের পর্দা কী হাড় পালটে দেওয়া যায় ?'

'ঠিকই। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী পুঁজ এবং প্রদাহর ফলে মাঝের কানের মধ্যে

যে তন্তুপ্রাচুর্য ঘটে তা কিন্তু কোন অপারেশনের দ্বারা সারান যায় না। তারা তাই সারাজীবনই ভোগে বধিরতায়। আর ওই জাতীয় রোগীর সংখ্যাই আমাদের দেশে বেশি। তাই অপারেশন করে পর্দা কী হাড় লাগিয়েও তাদের অধিকাংশরই কোন উপকার হচ্ছে না।'

'সে কী!'

'হ্যাঁ, আর এটাও তুমি নিশ্চয় জান যে কালা হওয়ার কী যন্ত্রনা? তাদের দেখে, অধিকাংশই দুঃখের চেয়ে মজাই পায় বেশি?'

'কিন্তু 'শ্রবণযন্ত্র' পরলে তো তারা আবার শুনতে পাবে?'

'তা পাবে। কিন্তু তোমার কী ধারণা আছে একটা অর্ডিনারী শ্রবণযন্ত্রের কত দাম?' ডাঃ চাটার্জি বিমলবাবুর দিকে তাকালেন। একটা ভাল চশমার চেয়ে ৫ থেকে ১০ গুণ বেশি। তাই ইচ্ছে করলেই কোন গরীব লোক কানের যন্ত্র কিনতে পারে না। অথচ রোগটা গরীবদের মধ্যেই বেশি হয়।'

'তাই বুঝি?' বিমলবাবু কথাটা শুনে মনে হয় খুব অবাক হলেন।

'হ্যাঁ।' ডাঃ চ্যাটার্জি একটু থেমে বললেন, 'আচ্ছা বিমল, তোমরা তা তোমাদের ক্লাব থেকে প্রতি বছরই কত সেবামূলক কাজ কর। বই বিতরণ কর, বন্যার্তদের জামা, কাপড়, কম্বল দাও, একবার শুনেছিলুম তোমরা চোখের ছানি অপারেশন ক্যাম্পও করেছিলে।'

'ঠিক-ঠিক।'

'তাহলে তোমরা কেন বধিরতা নিবারণের জন্যে কিছু কর না?'

'সত্যি, আসলে এ কথাটা কখনও আমাদের মাথাতেই আসেনি।' বিমলবাবু আপসোস করলেন।

'জান তো, কানের পুঁজ হওয়া বন্ধ হলে সমাজে শুধু বধিরদের সংখ্যাই কমবে না, সেই সঙ্গে বহু রোগী প্রাণেও বাঁচবে।'

'ঠিক বলেছেন বড়দা। আমিও মনে-মনে ওই কথাটাই ভাবছিলাম।'

'কে আর খবর রাখে বল যে, কানকে ঘিরে আছে ব্রেন, ভেতরের কানের লেবরিন্থ, মুখের পেশীদের চালক স্নায়ু অর্থাৎ 'ফেসিয়াল নার্ভ' ম্যাসটয়েড হাড়, ল্যাটারাল এবং জুগুলার শিরার মত সব নানান প্রয়োজনীয় অঙ্গ। যারা কানের পুঁজের দ্বারা আক্রান্ত হয় তাদের জীবন পর্যন্ত সংশয় হতে পারে।'

'আচ্ছা বড়দা, কানের পুঁজ কিভাবে ওদের আক্রমণ করে?' বিমলবাবু

প্রশ্ন করলেন।

'অনেকেরই কানের পুঁজের মধ্যে এক প্রকার বস্তু জন্ম নেয়—যার নাম, 'কোলেসটিয়াটোমা!' ওই 'কোলেসটিয়াটোমা' বস্তুটি ভারি মারাত্মক। কারণ তারা কানের চারপাশের হাড়ের মধ্যে ক্ষয় ঘটাতে পারে। আর ক্রমান্বয়ে হাড় খেয়ে খেয়ে তারা নিজের পথ করে নিয়ে এগিয়ে যায় এবং সামনে যা পড়ে তাকেই তারা আক্রান্ত করে।'

'বলেন কী!'

'হ্যাঁ, তবে ভাগ্যের কথা, সব পুঁজযুক্ত কানেই ওই 'কোলেসটিয়াটোমা বস্তুটি জন্মায় না।'

'আচ্ছা কোন রোগীর কানে ওই বস্তুটি আছে তা কী ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন?'

'নিশ্চয়, সেটা বোঝা যায় খুব সহজেই।'

'তাই নাকি, কিন্তু কিভাবে? ডাঃ চ্যাটার্জির কথাগুলো শুনতে-শুনতে বিমলবাবু মনে হল খুবই আগ্রাহান্বিত হয়ে পড়লেন।

'ওই জাতীয় রোগীদের মধ্যে যারা বলে, কানে খুব কম শুনছে, অথবা কানের পুঁজের থেকে খুব দুর্গন্ধ বেরচ্ছে এবং সেই সঙ্গে যারা মাথাধরা অথবা কান থেকে রক্ত পড়ার কথা বলে আমরা ধরেই নিই যে তাদের কানের মধ্যে 'কোলেসটিয়াটোমা আছে। আর কান পরীক্ষা করে এই ব্যাপারটা তো খুব ভাল ভাবেই বোঝা যায়।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, কানের পর্দার ফুটোর আকৃতি এবং অবস্থান দেখে, পুঁজের গন্ধ শুঁকে সন্দেহটা প্রায় পাকাই করে ফেলা যায়। যখন কানের এক্সরে করলেই দেখা যাবে, ম্যাসটয়েড হাড়ের মধ্যে ক্ষয় ধরেছে।'

'ওঃ, আজ অনেক কথা জানা গেল।' বিমলবাবু সব শুনে-টুনে দারুণ খুশি হলেন।

'হ্যাঁ, এইসব লক্ষণ বিচার করেই ডাক্তারবাবু কোন কোন কানের রোগীকে বলেন অপারেশন করাতে, আর কাউকে বা আবার শুধু ওষুধ-বিষুধ দিয়েই সারাতে চান।'

'অর্থাৎ কারও-কারও কানের পুঁজকে তাঁরা মনে করেন জীবনের জন্যে বিপদজনক এবং কারও পুঁজকে তাঁরা তা মনে করেন না এই তো?'

বিমলবাবু প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, ঠিক বলছ।'

'আচ্ছা বড়দা, আমি একজনকে চিনি, যার ছেলের কানের পুঁজ সারাতে একজন সার্জেন তার গলার টনসিল অপারেশন করতে চেয়েছিলেন।' বিমলবাবু আবার একটু এগিয়ে বসলেন।

'হ্যাঁ ওই যাদের বললাম নিরাপদ ধরনের রোগী, অর্থাৎ যাদের কানের পুঁজের মধ্যে কোলেসটিয়াটোম বস্তুটি নেই, তাদের অধিকাংশই হল অল্পবয়স্ক। আর তাদের কানের পুঁজের কারণটা থাকে নাকে কী গলায়। জান তো, কান আর নাকের মধ্যে একটা সংযোগী নল আছে, যার নাম 'ইউসটেচিয়ানটিউব ?' সেই নলের ভেতর দিয়ে নাক কী গলার প্রদাহ কানে প্রবেশ করে। তাই সাধারণ চিকিৎসায় নিরাপদ জাতীয় পুঁজ সারতে না চাইলে, ডাক্তারবাবুরা তখন সন্দেহ করেন, এর নাকে কী গলায় তেমন কোন কারণ নেই তো, যা সরাসরি কানে পুঁজ সৃষ্টি করছে ? আর জানবে, পরীক্ষা করে তাদের সবারই সত্যিই দেখা যায় গলায় কী নাকে নানান রোগ আছে। যেমন টনসিল, এডিনয়েড, সাইনাস প্রদাহ, কী নাকের ভেদকহাড়টি বেঁকা, এইরকম আরও কত কী। তখন তারা চান ওইসব রোগ অপারেশন করে সারিয়ে ফেলতে। তখন কানের পুঁজও যায় সেরে।'

'কী আশ্চর্য !'

'বিমল, আর কথা নয়। এবার তুমি এগিয়ে পড়। আমাকেও এবার যেতে হবে হাসপাতালে। সেখানে আবার জগা আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে।' ডাঃ চাটার্জি উঠে দাঁড়ালেন।

'ওমা তাই নাকি ? ইস্, দিলাম তো আপনার দেরি করিয়ে।'

'যাকগে, এখনও তেমন কিছু দেরি হয়নি। তবে কথাটা কিন্তু মনে রেখ। এবার যেন শুনতে পাই। তোমাদের ক্লাব কানের রোগীদের জন্যেও কিছু করছে।'

'নিশ্চয়। নিশ্চয়।' বিমলবাবু ডাঃ চ্যাটার্জিকে আশ্বস্ত করে বেরিয়ে পড়লেন।

এই সময়ে হঠাৎ জগার ভাই একটা এক্স-রে প্লেট হাতে-করে ঘরে ঢুকল।

'কিরে, ছেলেটার এক্স-রেটা এনেছিস ? কই দে । আরে এই তো দেখা যাচ্ছে, ম্যাসটয়েড হাড়ে ক্ষয় ধরেছে ।' এক্সরেটার দিকে তাকিয়েই ডাঃ চ্যাটার্জি চেঁচিয়ে উঠলেন ।

'তাহলে উপায় ?' কথাটা শুনে জগার ভাই মনে হয় ভয় পেয়ে গেল ।

'ডাক্তারবাবুরা মনে হয়, মেনিনজাইটিসটা সারিয়ে নিয়েই ওর ম্যাসটয়েড অপারেশন করবেন । আর তাতেই ছেলেটা চিরতরে ভাল হয়ে যাবে । ডাঃ চ্যাটার্জি আর দেরি না করে এবার হাসপাতালের পথে এগিয়ে পড়লেন ।

কেমন জব্দ—পল্টুকাকু

জানতো, পল্টুকাকুর একটা ভারি বদ অভ্যাস আছে । হাতের কাছে যা পান, তাই দিয়েই উনি কান খোঁচান । সবাই পল্টুকাকুকে অমন যা-তা দিয়ে কান খোঁচাতে বহুবারই বারণ করেছেন । পল্টুকাকু কিন্তু কোনদিন কারও কথাতেই কান দেন না ।

তবে কাল সকালে কিন্তু পল্টুকাকু ভারি ঝামেলায় পড়েছিলেন । পল্টুকাকু তখন একটা কাঠি দিয়ে কান খোঁচাচ্ছিলেন । হঠাৎ হয়েছে কী, কাঠিটা ভেঙে, তার একটা টুকরো কানের মধ্যে রয়ে গেছে । আর যায় কোথায়, পল্টুকাকু তো তখন ভয়ে চোখ দুটো গোল-গোল করে বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছেন ।

মহামায়াকাকীমা তো ব্যাপারটা জানতে পেরেই ঝেঁঝে উঠলেন । 'ঠিক হয়েছে । এবার যাও হাসপাতালে । ডাক্তারবাবুরাই বুঝিয়ে দেবেন, কাঠি দিয়ে কান খোঁচানর মজা ।'

'এ্যাঁ, হাসপাতালে যেতে হবে ?' পল্টুকাকু তো হাসপাতালের নাম শুনেই আঁতকে উঠলেন ।

'হাসপাতালে না গেলে, ওকাজ আর কে পারবে শুনি ? কানের মধ্যে থেকে কাঠি বার করা কি সহজ ব্যাপার ?'—মহামায়াকাকীমা আবার

ঝেঁঝে উঠলেন।

অগত্যা পল্টুকাকু সত্যিই গেলেন হাসপাতালে। পল্টুকাকুর ঘটনাটা শুনেই ডাঃ পাল বললেন, 'কী, কাঠি দিয়ে কান খোঁচাচ্ছিলেন? কেন, সকালে আর কোন কাজ ছিল না নাকি?'

'না, মানে...'পল্টুকাকুকে ঘাড় চুলকোতে দেখে, ডাক্তারবাবু বললেন, 'বলি, কানের গঠন সম্পর্কে কিছু জানা আছে?'

'আজ্ঞে না...'

'ঠিক ধরেছি। আর সেটা জানেন না বলেই কানে কাঠি দিতে আপনি ভয় পান না। কানের তিনটি অংশ। যেমন বাইরের কান, মাঝের কান আর ভেতরের কান। বাইরের কান বা শ্রুতিসুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য মাত্র এক ইঞ্চি। বাইরের কান আর মাঝের কানের মধ্যে থাকে কানের পর্দা বা কর্ণপটহ্। তাই কানে কিছু ঢোকালে, তা যদি আবার এক ইঞ্চির বেশি লম্বা হয়, তাহলে তা নিশ্চয় কানের পর্দাকে ফুটো করে দেবে।'

'বলেন কী!'...

'হ্যাঁ, এবার শুনুন মাঝের কানের কথা। সেখানে থাকে সারিবদ্ধভাবে শ্রবণের জন্যে প্রয়োজনীয় তিনটে কর্ণাস্থি। যাদের নাম হল—ম্যালিয়াস, ইনকাস আর স্টেপিস। এদের মাধ্যমেই শব্দ, কানের পর্দায় পৌঁছে, সেখান থেকে তা ভেতরের কানে প্রবেশ করে। কানে কিছু ঢোকালে সেটা কিন্তু ওই কর্নাস্থিগুলোকেও নাড়িয়ে-চাড়িয়ে দিতে পারে।

'আর ভেতরের কানে কী থাকে ডাক্তারবাবু?' পল্টুকাকু এবার ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলেন।

'ভেতরের কানে থাকে 'লেবরিন্থ'। যার মধ্যে থাকে শোনার জন্যে 'কটি অঙ্গ' এবং দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে তিনটি 'অর্ধচক্রাকার নালী', 'ইউট্রিকিল' এবং 'সাকিউল' অঙ্গ। আবার মাঝের কানকে ঘিরে আছে ওই ভেতরের কান ছাড়াও ম্যাসটয়েড হাড়, ব্রেন ও তার আচ্ছাদন, মেনিনজিস, জুগুলার ভেন, লেটারাল সাইনাস এবং আরো কত কী। ওই মাঝের কানের ভেতর দিয়েই আবার গমন করে ফেসিয়াল এবং কর্ডাটিম্পানাই নার্ভ।'

'এসব কী শোনাচ্ছেন ডাক্তারবাবু! ... আমি তো আপনার কথার কোন মানেই বুঝতে পারছি না।'



কাঠি দিয়ে কান খোঁচানো বিপজ্জনক

'বোঝার দরকার নেই। তবে শুধু এইটা বুঝলেই যথেষ্ট হবে যে কান নামক অঙ্গটি একটা ফালতু জিনিস নয়—বুঝলেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'...

'কানের অসুখ করলে, তাই শুধু শ্রবণ শক্তিরই ক্ষতি হয় না, সেই সঙ্গে মেনিনজাইটিস, কী ব্রেন অ্যাবসিস হয়েও রোগীর প্রাণ পর্যন্ত সংশয় হতে পারে। ফেসিয়াল স্নায়ু কী কর্ডাটিম্পানাই স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্থ হলে রোগীর মুখ বেঁকে যেতে পারে এবং খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ গ্রহণেও অসুবিধে হতে পারে।'

'সে কী !'

'হ্যাঁ',—ডাক্তারবাবু আবার চেঁচিয়ে উঠলেন। 'কারণ ওই ফেসিয়াল স্নায়ু এবং কর্ডা টিম্পানাই স্নায়ু দুটি যথাক্রমে মুখের পেশীদের শক্তি এবং জিভের খাদ্য আস্বাদনের ক্ষমতা জোগায়—তা জানেন ?'

'আরিঃ বাস।' পল্টুকাকু সব শুনেটুনে এবার ভয়ে ভয়ে ঢোঁক গিললেন। 'এসব তো কিছুই আমি জানতাম না'। তাই সেই কবে থেকে কারও কথা না শুনে আমি যা পাই তাই দিয়েই তো কান খুঁচিয়ে আসছি। (ছবি-৪) ভাগ্যিস কোনদিন কিছু হয়নি।'

'বলি কানের রোগের শেষ পরিণামটা কী তা জানা আছে তো ?'

'আজ্ঞে না'।

'বধিরতা।'

'ঠিক-ঠিক।'

'যদি কানটা নষ্ট হয়ে আপনি কালা হয়ে যান, তাহলে কী হবে ?'

'আজ্ঞে সেকথাটা তো কোনদিন ভাবিনি।' পল্টুকাকু দুঃখু-দুঃখু মুখ করে উত্তর দিলেন।

'তা কেন ভাববেন। জানেন তো, লোকে কানা কী খোঁড়া দেখলে ভারি দুঃখ পায়, কিন্তু কালা দেখলে হাসে ?'

'ঠিক বলেছেন ডাক্তারবাবু। আমার এক মামা আছেন, কালা। বাড়িতে সবাই তাকে দুরছাই করে। কেই তার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। আমরা সব তাকে 'কালামামা' বলে ডাকি।'

সেকি ! আপনারা তাকে একটা কানের যন্ত্র কিনে দিলেই তো পারেন। আপনারা কী বোঝেন না, কালারাও আমাদের কাছে অন্য যে কোন প্রতিবন্ধীর মতই সমান সহানুভূতি প্রার্থী ?'

কেমন নিশ্চিতভাবে কানটিকে সঁপে দিয়েছেন এক আনাড়ির হাতে



'কিন্তু উনি যে ভীষণ গরীব। যন্ত্রের যা দাম উনি অত টাকা পাবেন কোথায় ?'

'ঠিক আছে, আজই তাহলে যাবার আগে আমার থেকে কটা ঠিকানা নিয়ে যাবেন। তাদের কাছে আবেদন করলে উনি নিশ্চয় ফ্রি-তে একটা যন্ত্র পেয়ে যাবেন।'

'কিন্তু সেও তো আমরা করেছি। তা প্রায় দু বছর হল। তারা তো কেউই কোন উত্তরই দেননি।'

'বলেন কী!'

'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু সত্যি বলছি।'

'তাহলেই বুঝতে পারছেন তো, কালাদের দুঃখ কেউই তেমন বুঝতে চায় না। না সমাজে—না সংসারে।'

'তাই তো দেখছি।'

'তাহলে এবার বুঝলেন তো, যদি কানে কাঠি দিতে-দিতে কোনদিন সত্যিই আপনার কানটাও ঘুঁচে যায়, তখন আপনাকে দেখে সবাই হাসবে। সবাই তখন আপনাকে উপহাস করবে। আসুন, এই চেয়ারটাতে বসুন।' ডাক্তারবাবু পল্টুকাকুকে সামনের চেয়ারটাতে বসতে ইশারা করলেন। পল্টুকাকু চেয়ারটাতে বসতেই ডাক্তারবাবু একটা চিমটি দিয়ে ভাঙা কাঠিটাকে ধরে টুক করে বার করে আনলেন। 'এই নিন আপনার কাঠি।' উনি কাঠিটাকে পল্টুবাবুর হাতে গুঁজে দিলেন।

কাঠিটা ফেরৎ পেয়েই পল্টুকাকুর মুখটা খুশিতে ভরে উঠল।

'এবার বলুন তো, আপনি কেন রোজ কাঠি দিয়ে কান খোঁচান ?' ডাক্তারবাবু বেশ গম্ভীর হয়ে পল্টুকাকুকে প্রশ্ন করলেন।

'কী করব, কানটা যে ভীষণ চুলকায়।'

'কান চুলকোনো তো একটা অসুখ। সে জন্যে এতদিন ডাক্তার দেখাননি কেন ?'

'আমি ভাবতুম, কানে বুঝি খোল-টোল কিছু আছে। তাই কাঠি দিয়ে সেটা বার করে আনার চেষ্টা করতুম। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি আমার কানে খোল দেখতে পেলেন না ?'

'—কই না।'

'সে কী! তাহলে আমার কানটা অমন চুলকায় কেন ?'

'সেটাইতো বলছি । আসলে আপনার কানে একরকম ঘা হয়েছে । যেটা একটু চিকিৎসা করলেই সেরে যাবে । এই নিন ।' ডাক্তারবাবু একটা প্রেসক্রিপশান লিখে পল্টুকাকুকে দিলেন । 'এই ওষুধটা কদিন লাগালেই দেখবেন আপনার কান চুলকানি সেরে গেছে ।'

পল্টুকাকু প্রেসক্রিপশানটা নিয়ে বললেন, 'কারও কান চুলকালেই তার মানে বুঝব তার কানে ঘা হয়েছে ?'

'না-না, তা কেন ? মানুষের কান অনেক কারণেই চুলকাতে পারে । যেমন কানের চামড়ায় প্রদাহ কী এলার্জি হলে, 'ফাংগাস' হলে, মাথায় বেশি খুসকির দরুণ কানের চামড়ায় প্রদাহ সৃষ্টি হলে কিংবা কানের মধ্যে খোল হলে কী কোন বিজাতীয় বস্তু ঢুকলে কান চুলকয় ।'

'তখন তাহলে কী করা উচিত ?'

'কানে কারও কষ্ট হলেই তার উচিত কোন কানের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা ।'

'কিন্তু আমরা প্রায়ই যে দেখতে পাই, লোকে রাস্তায় বসে কান পরিষ্কার করাচ্ছে ।' (ছবি-৫)

'ছিঃ, কানের মত অমন মূল্যবান কোন অঙ্গকে কী ওইসব আনাড়িদের হাতে সঁপে দিতে আছে ?'

'আচ্ছা, আমাদের তাহলে ঠিক কী ভাবে কানের যত্ন নেওয়া উচিত বলুন তো ?' পল্টুকাকু এবার ডাক্তারবাবুকে প্রশ্ন করলেন ।

'কান না খোঁচালে, পচাপুকুরে স্নান না করলে, কানের কোনও-রকম কষ্টকে অবহেলা না করলে, নাকের সর্দিকে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করে সারিয়ে ফেললে, কানে যা-তা কোন তেল কী নিছক আন্দাজে ওষুধ না দিলে এবং কোন জোর শব্দকে এড়িয়ে চললেই কান ভাল থাকে ।'

'সবই বুঝলাম ডাক্তারবাবু । কিন্তু কান ভাল রাখতে নাকের সর্দিকে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করে ভাল করে ফেলার উপদেশ দিলেন কেন ?'

'হ্যাঁ প্রশ্নটা আপনি ভালই তুলেছেন । শুধু নাকের সর্দিই নয়, কান ভাল রাখতে চাইলে গলার কোন অসুখকেও অবহেলা করা উচিত নয় । কারণ, নাক-কান আর গলা এরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত । তাই এদের একের অসুখ হলেই আর-একজনও তখন আক্রান্ত হতে পারে ।'

'বলেন কী ! এ সব তো আমরা কিছুই জানতুম না । আর খুব জোর

আওয়াজেও কী কানের ক্ষতি হয় ?' পল্টুকাকু ফের একটা প্রশ্ন তুললেন।

'নিশ্চয়। ওই যে আগেই বলেছিলুম, ভেতরের কানে থাকে শ্রবণের জন্যে প্রয়োজনীয় 'কটি অঙ্গ' নিশ্চয় মনে আছে ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'ওই 'কটি অঙ্গ' একটি স্নায়ুর দ্বারা ব্রেনের টেম্পোরাল খণ্ডের সঙ্গে যুক্ত যেটিকে বলে 'শ্রবণ-স্নায়ু।' ব্রেনের টেম্পোরাল খণ্ডে থাকে, 'শ্রবণ কেন্দ্র।' আর কটি অঙ্গের আগায় থাকে অসংখ্য 'হেয়ার সেল।' অর্থাৎ চুলের মত স্নায়ুগুচ্ছ। বাইরের শব্দ শ্রুতি-সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে গমন করে প্রথম উপস্থিত হয় কানের পর্দায়। ফলে পর্দায় জাগে কম্পন। তারপর সেই শব্দ মাঝের কানের কর্ণাস্থির সারির ভেতর দিয়ে পৌঁছয় ভেতরের কানে। ফলে কটি অঙ্গে জাগে স্পন্দন। তখন ওই হেয়ার সেলগুলি হয়ে ওঠে উত্তেজিত। যে উত্তেজনা শ্রবণ স্নায়ু ধরে পৌঁছয় ব্রেনে। যেখানে সেই শব্দের প্রকৃত অর্থের মূল্যায়ন হয়। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারি কে কথা বলছে, কী তার মানে ইত্যাদি।'

'ও, তার মানে, বেশি শব্দ কানের...'

'হ্যাঁ, কোন শব্দের পরিমাপ যদি খুব বেশি হয়...'

'কত বেশি ডাক্তারবাবু ?'

'আমরা শব্দের পরিমাপ বোঝাই 'ডেসিবেল' ইউনিট দিয়ে। কোন শব্দ যদি ৯০ ডেসিবেলের মত তীব্র হয়, তাহলে তা ওই কটি অঙ্গের 'হেয়ার সেল'গুলিকে নষ্ট করে দিতে পারে।'

'বলেন কী, একেবারে পাকাপাকি ভাবে নাকি ?'

'হ্যাঁ, শব্দ যত বেশি তীব্র হবে...বধিরতাও তার ততই পাকাপাকি বা চিরস্থায়ী হবে। সেই জন্যেই আমরা বলি, সদাই সজাগ থাকতে। যেন কানের সামনে কোন বড় রকমের শব্দ না হয়।'

'ও, তাই বুঝি আজকাল শব্দ দূষণ দূর করার জন্যে এত চেষ্টা চলছে ?'

'হ্যাঁ। শব্দ তো শুধু বধিরতাই ঘটায় না, সেই সঙ্গে তা আমাদের ঘুম, মানসিক-চিন্তা কী স্মৃতি-শক্তি সবই কমিয়ে দেয়। সেইসঙ্গে ঘটায় হার্টের রোগ, পেটের আলসার, বদহজম, আরও কত কী।'

'কিন্তু তাহলে যারা কোন প্রচণ্ড শব্দময় পরিবেশ কাজ করেন—তারা কী করে নিজেদের রক্ষা করবেন ?'

'তাদের উচিত কাজের জায়গায় কানে 'প্লাগ' পরে থাকা। যে প্লাগ ব্যবহার করে সাঁতারুরা কানকে জল থেকে বাঁচাতে, সেই প্লাগই আবার কানকে বাঁচাতে পারে ক্রমাগত শব্দময় স্থানে থাকার নানান বিষময় প্রতিক্রিয়া থেকেও।'

'ইস, দেশ থেকে ইলিকট্রিক হর্ন বাজান, যখন-তখন মাইক কী বোমা ফাটান প্রভৃতি আজেবাজে ক্ষতিকর ব্যাপারগুলো উঠে গেলে কী ভালই না হয়, তাই না ডাক্তারবাবু ?'

'নিশ্চয়। তখন দেখবেন দেশে কালার সংখ্যা কমে গেছে, মাথাধরা-মাথাঘোরা অনিদ্রার মত রোগগুলোও সব কমে গেছে। তেমনি দেখবেন হার্টের এবং পেটের অসুখও অনেক কমে গেছে।'

'ইস, সে দিন কবে আসবে কে জানে। আচ্ছা ডাক্তারবাবু চলি। নমস্কার।' পল্টুকাকু এবার উঠে দাঁড়ালেন।

'আসুন। তবে আজ যা শুনলেন এবং বুঝলেন তা কিন্তু আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে শেখাবেন—কেমন।'

'নিশ্চয়। আপনি এতটা সময় ব্যয় করে আমাকে এত-কিছু শেখালেন আর আমি কী তা কখনও ভুলে যাব ? আচ্ছা ডাক্তারবাবু, তাহলে আর কটা কথা জেনে যাই। কানে কী তেল দেওয়া খারাপ ?'

'রশুন তেল, গেঁড়ির তেল, কানচটা তেল ইত্যাদির মত যত-সব তেল দেওয়া খুবই খারাপ। আর খারাপ হল, কানে কোন কষ্ট হলেই তা কেন হচ্ছে না জানতে চেয়ে—তেল দিয়ে ভাল করার চেষ্টা। সাধারণে যেমন কথায়-কথায় কানে তেল দিতে উপদেশ দেয়, লক্ষ্য করবেন, ডাক্তারবাবু কিন্তু কখনই তা বলেন না। বিশেষ কটা কারণ ঘটলে, যেমন কারও কানে ঘনঘন খোল হলে, কী কারও কান শুকনো মনে হলে, ডাক্তারবাবুরা কানে তেল দিতে উপদেশ দেন। আর সে ওইসব যা-তা তেল নয়। তারা তখন বলেন, কানে গ্লিসারিন কী অলিভ অয়েল দিতে।'

'ঠিক আছে ডাক্তারবাবু আর আপনাকে বিরক্ত করব না। এবার খালি আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিন, কী-কী লক্ষণ দেখলে বুঝব কানে রোগে হয়েছে।'

'সে লক্ষণগুলি হল—কানে ব্যথা এবং পুঁজ কী জল হওয়া, কম শোনা, কান ভোঁ ভোঁ করা এবং মাথা ঘোরা।'

'কানের রোগে মাথাও কী ঘুরতে পারে নাকি ?'

'নিশ্চয় পারে। কারণ ভেতরের কানের মধ্যেই যে দেহের ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গগুলিও থাকে।'

'ও, ঠিক ঠিক।' পল্টুকাকু আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়েপড়লেন।

বাড়ি ফেরার পথে পল্টুকাকু মনে-মনে নিজের কান ধরে প্রতিজ্ঞা করলেন,'জীবনে আর কোনদিন কানে কাঠি দিচ্ছি না।'

বুবলি আবার গান গাইল

'বুবলি কেন স্কুলে আসছে না বলতো ? ওর কী তবে অসুখ বিসুখ হল নাকি ?'

সমুর কথা শুনে মালা আর পিংকী বলল, 'চল না একদিন ওদের বাড়ি যাই। জেনে আসি ও কেন কামাই করছে।'

'বাড়ি যাব বললেই কী যাওয়া যায় ? আমরা কী কেউ ওর বাড়ি চিনি ?' সমু ওদের কথা শুনে ঝেঁঝে উঠল।

'ইরাকাকীমা তো চেনেন। উনি তো বুবলির মায়ের খুব বন্ধু। ইরাকাকীমাকে জিজ্ঞাসা করলেই তো জানতে পারব, বুবলিদের বাড়ি কোথায়।'

'থাক, তোমাদের আর বুবলির বাড়ি গিয়ে কাজ নেই।' ইরাকাকীমাকে প্রশ্ন করতেই উনি ধমক দিলেন। 'ওকে এখন ডাক্তারবাবু এক মাস মৌন থাকতে বলেছেন। তাই ও স্কুলে যাচ্ছে না।'

'কিন্তু সামনেই তো পরীক্ষা। তাই রোজই তো এখন নতুন নতুন পড়া দিচ্ছে।' সমু ইরাকাকীমার কথায় খুব অবাক হল।

'সে সব পরে ভাবা যাবে। আগে তো ওর গলাটা ভাল হোক।'

ইরাকাকীমার কথা শুনে সমু, পিংকী আর মালা এ-ওর মুখের দিকে তাকাল। বোঝা গেল, ওরা কেউই ইরাকাকীমার কথার কোন মানেই বুঝতে পারল না।

এর ঠিক কদিন বাদেই বুবলি একদিন ওর মা-বাবার সঙ্গে ইরাকাকীমাদের বাড়িতে এসে হাজির। সমুরা তখন সামনের মাঠে এক্কা দোক্কা খেলছিল। হঠাৎ বুবলিকে দেখতে পেয়েই ওরা সব খেলা ফেলে দৌড়ল।

'কিরে বুবলি তুই স্কুলে আসছিস না কেন ? পরীক্ষা দিবি না ?' সমু হাঁফাতে হাঁফাতে প্রশ্ন করল।

'তোর হয়েছেটা কী ?' পিংকী, মালা, বুবুন ওকে ঘিরে ধরল।

বুবলি কিন্তু ওদের কথার কোন উত্তর দিল না। শুধু মুখ টিপে ফিকফিক করে হাসল।

'এ আবার কী ! বুবলি কথা বলছে না কেন ?' ওরা তো সব বুবলির কাণ্ড দেখে অবাক।

'হ্যাঁগো, বুবলি আমাদের কথার কোন উত্তর দিচ্ছে না কেন ?' পিংকী দৌড়ে গিয়ে ইরাকাকীমাকে প্রশ্ন করল।

'বললাম যে ওর এখন কথা বলা বারণ। ডাক্তারবাবু ওকে এখন একমাস মৌন থাকতে বলেছেন।' ইরাকাকীমা উত্তর দিলেন।

'কিরে বুবলি, তুই ওদের সঙ্গে লিখে লিখে কথা বল না' পাশ থেকে বুবলির মা চেঁচিয়ে উঠলেন।

'লিখে লিখে কথা, সে আবার কী ?' দীপুকাকীমার কথায় ওরা খুব অবাক হল।

বুবলি মায়ের কথাটা শুনেই চট করে ওর কাঁধ ব্যাগ থেকে একটা খাতা-পেন্সিল বার করে ফেলল।

'দেখি দেখি…দেখি খাতাটা।' সমু খাতাটা টেনে নিয়ে তার দু-একটা পাতা পড়েই খুব অবাক হল। এসব আবার কী লেখা ! বুবলি কোথায় লিখেছে…ডাক্তারমামা এসেছিল…বাবাকে দেখা করতে বলেছেন। কোথাও লেখা, মাসি ফোন করেছিল…আমি উত্তর দিইনি।

'এসব কী লিখেছিস রে !' খাতাটা পড়েই সমু চেঁচিয়ে উঠল। পিংকী, বুবলি আর মালা এবার ইরাকাকীমাকে ঘিরে ধরল্। 'বল না কাকীমা, বুবলি কেন কথা বলছে না ?'

মুকুলবাবু আর অজিতবাবু তখন সবে জমিয়ে বসেছেন, আড্ডা দেবেন বলে। মুকুলবাবু বললেন, 'আজ আড্ডা না মেরে বরং এই বাচ্চাগুলোকেই

ভাল করে বুঝিয়ে দাও, বুবলির কী হয়েছে। মনে হয় ঘটনাটা শুনলে ওরা কেউ আর বুবলির মত ভুল করবে না।'

'সেই ভাল।' দীপু আর ইরাকাকীমাও মুকুলবাবুর কথায় রাজি হয়ে গেলেন। আর তাই শুনেই ওরা সব ঝপাঝপ মেঝেতে চুপটি করে বসে পড়ল।

'তোমরা তো জান, বুবলি কেমন সুন্দর গান গাইতে পারত?' দীপুকাকীমা ওদের প্রশ্ন করল।

'খুব-খুব।' সমু উত্তর দিল।

'তোমাদের এও নিশ্চয় মনে আছে যে বুবলি অযথা কেমন চেঁচামেচি করত।'

'খুব মনে আছে। খেলার মাঠে ওর গলাই তো সবার আগে শোনা যেত।' পিংকী উত্তর দিল।

'আর ওই রকম ক্রমে চেঁচাতে চেঁচাতে ওর গলাটা শেষে একদিন একদম বসে গেল। শুরুতেই ওকে আমরা সবাই সাবধান করেছিলাম। ও কিন্তু তখন কারও কথাই শোনেনি।'

'তারপর?'

'তারপর একদিন ওকে আমরা এক গলার ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে গেলুম। তিনি ওকে পরীক্ষা করে বললেন, দীর্ঘকাল ধরে বুবলি ওর গলাকে তার স্বাভাবিক শক্তির চেয়ে বেশি করে প্রয়োগ করেছে বলেই আজ ওর এই দশা হয়েছে। তাছাড়া উনি বললেন, বুবলির নাকি কথা বলার পদ্ধতিতেও ভুল ছিল।'

'তাহলে এখন কী হবে?'—পিংকী জানতে চাইল।

'ডাক্তারবাবু বলেছেন, একমাস মৌন থাকলে নাকি এযাত্রা ও আবার ভাল হয়ে যেতে পারে। সেই সঙ্গে উনি অবশ্য কিছু ওষুধ, বিষুধও দিয়েছেন। যেমন ভিটামিন A-E বড়ি স্টোরোডিন ইনজেকশন। গরম জলের ভাপ নিতেও বলেছেন—দিনে দুবার।'

'একমাস বাদে ও আবার ভাল হয়ে যাবে তো?' পিংকী জানতে চাইল।

'ভাল হবে বটে। তবে আবার বেশি বকবক কী চিৎকার চেঁচামেচি

করলে ফের গলা ধরবে। শেষে বারবার অমন গলা ধরলে একদিন আসবে যখন আর কোন ওষুধেই ও ভাল হবে না।'

'কোন অপারেশন-টপারেশন করলেও তখন ওর গলাটা আবার ভাল হবে না ?' পিংকী প্রশ্ন করল।

'তোমার মত আমরাও তাই জানতে চেয়েছিলুম। ডাক্তারবাবু বললেন, 'অপারেশন করে তখন কথা বলার উন্নতি ঘটান গেলেও, গানের গলার কিন্তু কিছুই উন্নতি ঘটবে না।'

'তাহলে আর কী লাভ হবে ?' সমু আপসোস করল।

'ঠিকই তো।'—দীপুকাকীমা বললেন, 'ভাল গান গাইতে না পারলে, ওকে সবাই তখন কী আর তেমন করে ভাল বাসবে ? ভাল গান গাইতে পারে বলেই তো বুবলিকে সবাই অত ভালবাসে।'

'ডাক্তারবাবু আরো কী বলেছেন জানতো ?'—পাশ থেকে মুকুলবাবু প্রশ্ন করলেন।

'কী বলেছেন'—ওরা সবাই জানতে চাইল।

'ডাক্তারবাবু বলেছেন গান, নাটক, আবৃত্তি এসব করার শক্তি তো সবার থাকে না। তাই যারা ওইসব শক্তির অধিকারী তাদের উচিত নিজেদের গলা সম্পর্কে খুবই সতর্ক থাকা। এছাড়াও ডাক্তারবাবু আরও একটা প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন।'

'কী সেটা'—সমু জানতে চাইল।

'ডাক্তারবাবু বললেছন, মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে তার কণ্ঠস্বরের ওপর। তাই কেউ কণ্ঠস্বর হারালে, তার ব্যক্তিত্বও হারিয়ে যায়।'

'ঠিক-ঠিক।' পাশ থেকে অজিতবাবু বললেন, 'এই আমাকেই দ্যাখো না। গলার স্বরটা আমার সরু বলে, কেউই আমাকে তেমন মানতে চায় না।'

'আচ্ছা, এ রোগটার নাম কী ?' সমু জানতে চাইল।

'সিংগারস নডিযুল।' দীপুকাকীমা ওর ব্যাগ থেকে প্রেসক্রিপশনটা বার করে বললেন, 'এই দ্যাখ, ডাক্তারবাবু আবার রোগটার একটা ছবিও এঁকে দিয়েছেন।'

'কই দেখি।' ওরা সবাই তখন প্রেসক্রিপশনটার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখল, দুটি স্বরতন্ত্রী বা ভোকাল কর্ডের ছবি এঁকে ডাক্তারবাবু তাদের

সামনের দিকে ছোট্ট করে দুটো ফুসকুড়ি এঁকেছেন।

'এই ফুসকুড়ি দুটোর জন্যেই কী ওর গলাটা অমন ধরে গেছে?'

'হ্যাঁ। বেশ কিছুদিন আবার কথা বলা বন্ধ রাখলে, ওই ফুসকুড়ি দুটো মিলিয়ে যায়। তখন গলার স্বর আবার হয়ে ওঠে স্বাভাবিক।'

'কিন্তু রোগটার নাম 'সিংগারস নডিয়ুল' হল কেন?' ও রোগ কী শুধু গায়ক গায়িকাদেরই হয় নাকি?' বুবুন প্রশ্ন করল।

'না—না তার কোন মানে নেই। ডাক্তারবাবুকে আমিও ওই প্রশ্নটা করেছিলুম। উনি বললেন, নাম সে যাই হোক, আসলে যে বেশি বকে, তারই ওই রোগ হয়। তবে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদেরই এ রোগটা হয় বেশি।'

'যাক, তাহলে অন্তত আমার আর গলা ধরার ভয় নেই'—পাশ থেকে অজিতবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

'সে আবার কী কথা? সিংগার নডিয়ুল ছাড়া গলা কী আর অন্য কোন কারণে ধরে না?

'সেকি! গলা ধরার আরো কারণ আছে নাকি? শুনি শুনি সে কারণগুলো কী কী'— অজিতবাবু এগিয়ে বসলেন।

'ডাক্তারবাবু বলেছেন, ছোটদের প্রধানত গলা ধরে টনসিল, এডিনয়েড, বুকের সর্দিকি নাকের এলার্জির প্রকোপে। আর খেলাধুলোর সময় অহেতুক চেঁচালে। আর বড়দের গলা ধরে, সিগারেট খেলে, ঠাণ্ডা লাগালে, সর্দ্দি কাশির চিকিৎসা না করালে, বেশি চেঁচালে। তখন তাদের লেরিনজাইটিস, ফেরিনজাইটিস, নডিয়ুল, কেরাটোসিস, প্যারালিসিস এমন কী ক্যান্সারও হতে পারে।'

'কিন্তু ডাক্তারবাবু যে বলেছিলেন বুবলির কথা বলার পদ্ধতিতেও নাকি ভুল আছে? সেটা কী করে শোধরাবে?'—পিংকী প্রশ্ন করল।

'ঠিক-ঠিক, সেটাই বলতে ভুলে যাচ্ছিলুম। ডাক্তারবাবু ওকে সেটা শিখিয়েও দিয়েছেন। কথা বলা উচিত ধীরে ধীরে, কেটে কেটে। বুকে যথেষ্ট পরিমাণে হাওয়া ভরে নিয়ে, তা ছাড়ার সময়। আর বলেছেন, যারা গান শেখে, তাদের উচিত, ভাল গানের মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে আগে তার নিজের গলার স্কেলটা কী, তা ঠিক করে জেনে নেওয়ার।

তা না নিলে, ভুল স্কেলে গান গাইলে গানের গলা চিরতরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

'আর একটা কথা বললে না তো।' মুকুলবাবু পাশ থেকে টিপ্পনী কাটলেন।

'কী কথা ?'

'ওই যে, সেই কথাটা। যখন তখন চক্‌চক্ করে ঠাণ্ডা জল, আইসক্রীম কী কোল্ড ড্রিংকস খাওয়ার কথাটা।'

'কত আর মনে করে বলা যায় বল।' দীপুকাকীমা বিরক্ত হলেন। 'গান, নাটক কী আবৃত্তি করে সুনাম হবে তো ওদেরই। তাই এত বলেও যদি ওদের বোঝান না যায়, তাহলে আর কী করা যাবে।'

'বুবলির তাহলে কদিন মৌন থাকা হল ?' অজিতবাবু প্রশ্ন করলেন।

'আজ একত্রিশ দিন।' দীপুকাকীমা হিসেব করে উত্তর দিলেন।

'তাহলে তো আজ ওকে গান গাইয়ে দেখা যেতে পারে। একমাস তো হয়ে গেছে।'

'তা অবশ্য দেখা যেতে পারে। আগামী পরশুদিনই তো ওর আবার দেখাতে যাবার কথা। আর ডাক্তারবাবুও বলে ছিলেন, আসার আগে একবার গান গাইয়ে দেখে নিতে, ওর গলার কতটা উন্নতি হল।' দীপুকাকীমা উত্তর দিলেন।

'ওমা, তাই নাকি ? দাঁড়াও, আমি তাহলে হারমনিয়ামটা নিয়ে আসি।' ইরাকাকীমা উঠে গেলেন।

বুবলি গান গাইবে শুনেই, বুবুন, সমু, পিংকী আর মালা নড়ে-চড়ে বসল।

বুবলি গানটা ধরতেই মুকুলবাবু চমকে উঠলেন। 'বাঃ, এইতো দেখছি বুবলি আবার ঠিক আগের মত গান গাইছে।'

অজিতবাবু পাশ থেকে ফিস-ফিস করে বললেন, 'মেয়েটার গলা বটে।'

দীপুকাকীমা মনে মনে ভাবলেন, গানটা শেষ হলেই বুবলি মনে করিয়ে দিতে হবে। এবার থেকে গলাটাকে ভাল রাখার দায়িত্ব ওর-ই। বারবার গলা ভাঙলে সে কিন্তু আর ভাল নাও হতে পারে।

টুমটুমি কী কথা বলবে

চুমকির আজ কদিন হল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তাই ও ভেবেছিল একদিন ডালিমদের বাড়ি আড্ডা মারতে যাবে। সারাদিনটা সেদিন শুধু ওরা টিভি দেখে আর গল্প করে কাটাবে। কিন্তু সেদিন টুমটুমিকে নিয়েই যত ঝঞ্ঝাট বাধল।

'দুশ্, কেন শুধু শুধু এই মেয়েটাকে নিয়ে এলি বলতো ? ও কী আমাদের এক দণ্ড স্থির হয়ে বসতে দেবে ?' টুমটুমিকে দেখেই ডালিম চেঁচিয়ে উঠল।

'কী করি বল, ও যে আমায় বেরুতে দেখে কিছুতেই ছাড়ল না। ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার কোলের ওপর।' চুমকি উত্তর দিল।

'কেন, ওকে ওর দিদির কাছে রেখে এলেই তো পারতিস ?' ডালিম আবার রাগ করল।

'কিন্তু ওর দিদি যে ওকে মোটেই রাখতে চায় না।'

'সে কিরে !' ডালিম কথাটা শুনে খুব অবাক হল। টুমটুমি চুমকির খুড়তুতো বোন। থাকে ওরা এক বাড়িতেই। টুমটুমি জন্ম থেকেই কালা-বোবা। তাই পাড়া শুদ্ধু সবাই টুমটুমিকে খুবই ভালবাসে। ওকে দেখলেই দুঃখ পায়। আর সেই টুমটুমিকে কিনা ওর দিদি মোটে কাছেই রাখতে চায় না ?'

'হ্যাঁরে, ওর দিদি বলে, টুমটুমি যা দুরন্ত। ওকে আমি সামলাব কী করে ?'

'কথাটা অবশ্য ঠিক।' ডালিম বলল, 'ও শুধু কালা-বোবাই নয়, সেই সঙ্গে ও ভারি চঞ্চল। একদণ্ডও ও মোটে স্থির হয়ে বসতে চায় না।'

'কিন্তু জানিস', চুমকি বলল, 'আমি লক্ষ্য করেছি, ও রাস্তায় বেরুলে একদম ঠাণ্ডা হয়ে যায়।'

'কেন বলতো ?' ডালিম জানতে চাইল।

'আসলে ও তো কিছু শুনতে পায় না। তাই মনে হয়, নতুন কিছু চোখে পড়লে, ও অমন অবাক হয়ে, লক্ষ্মী মেয়ের মত, সেইসব তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখে।'

'তাহলে চল, আমরা বরং ওকে নিয়ে পার্কে গিয়ে বসি। ও মনে হয়, সেখানে গিয়ে আপন মনে খেলবে। আর আমরাও তখন দুদণ্ড গল্প করতে পারব।'

'ঠিক বলেছিস।' ডালিমের কথায় চুমকি রাজি হয়ে গেল।

'আচ্ছা ও কী সত্যিই কোনদিন কথা বলতে শিখবে না ?' পার্কে গিয়ে বসতেই, টুমটুমি সত্যিই আপন মনে খেলতে শুরু করে দিল। আর চুমকিরাও তখন গল্প জুড়ে দিল।

'তাই তো শুনছি।' চুমকি উত্তর দিল। 'হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা বলেছেন, ওর কানে যন্ত্র পরিয়ে দিতে। কানে শুনতে পেলে, আশা করা যায়, তখন ও কিছু বলতেও শিখবে। পরে বড় হলে, ওকে তখন কোন কালাবোবাদের স্কুলে ভর্তি করে দিতে হবে।'

'সে আবার কোথায় ?' ডালিম প্রশ্ন করল।

'কলকাতায়।'

'সেকি রে ! ওকে তার মানে কথা শেখাতে রোজ কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে ?' কেন, সেখানকার কোন স্কুলে ওকে ভর্তি করে রাখা যায় না ?' ডালিম জানতে চাইল।

'না। কাকাবাবু খোঁজ নিয়েছিলেন। একটু বড় ছেলেমেয়েদের ছাড়া তারা ভর্তি নেন না।'

'সেকি ! সব কালাবোবাদের স্কুলেরই কী ওই একই নিয়ম ?'

'কিছু প্রাইভেট স্কুল আছে, সেখানে নাকি তারা বাচ্চাদেরও ভর্তি নেয়। কিন্তু সে খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। কাকাবাবুর দ্বারা সম্ভব নয়।'

'তাহলে কাকাবাবু এখন কী ঠিক করেছেন ? ওর কানে যন্ত্র পরিয়ে বাড়িতেই কী ওকে এখন কথা শেখাবেন নাকি ?'

'যন্ত্রেরও তো শুনছি অনেক দাম। যা নাকি সবার দ্বারা কেনা সম্ভবই নয়।' চুমকি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'সেকি ! তাহলে টুমটুমির কী হবে ?'

'সেইকথা ভেবে-ভেবেই তো কাকীমার অমন শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। শুনছি ওদের মত ছেলেমেয়েদের জন্যে নাকি আমাদের দেশে আজও তেমন কোন ভাল ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।'

'আশ্চর্য !' ডালিম কথাটা শুনে বেশ অবাক হল।

'অথচ অন্য সব উন্নত দেশে ওদের জন্যে যা করা হয় তা শুনলে তুই অবাক হয়ে যাবি।'

তুই কী করে জানলি ?

'কাকীমার কাছে শুনেছি। উনি তো আজকাল এইসব নিয়ে সারাদিনই পড়াশোনা করেন।'

'কাকীমা কী বলছিলেন শুনি ?'

'কাকীমা বলছিলেন, আজকাল সব উন্নত দেশেই নাকি ভাবী মায়েদের স্বাস্থ্যের প্রতি ডাক্তারবাবুরা প্রথম থেকেই দারুণ লক্ষ্য রাখেন। যাতে না কোন অযত্নের কারণে ওইরকম কোন শিশুর জন্ম হতে পারে। জন্মের ঠিক পরেই, ঠিক ওই একই কারণে সেখানে শিশুদের প্রতি দারুণ যত্ন নেওয়া হয়। যাতে কোন অসুখের কারণে না তাদের কান নষ্ট হয়।'

'আচ্ছা, কেউ কালা হয়ে জন্মালেই কী সে বোবা হয় ?'

'হ্যাঁ। লক্ষ্য করবি, যারা বোবা, তারা অধিকাংশ হল কালা। আসলে আমরা কথা বলতে শিখি, কানে শুনে। তাই কোন শিশুর জন্মের আগে, কী ঠিক পরেই, কোন অসুখ বা আঘাতের কারণে কান নষ্ট হয়ে গেলে, সে বোবা হয়ে যায়। অবশ্য কিছু-কিছু বাচ্চা আছে, যারা শুনতে পেলেও কথা শেখে না, জন্মগত কোন মস্তিষ্ক কী স্নায়ুর রোগের কারণে।'

'বাঃ, তুই তো দেখছি ওদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিস।' ডালিম চুমকির জ্ঞানের প্রশংসা করল।

'হ্যাঁ, কাকীমাই আমাকে সব শিখিয়েছেন।' চুমকি বলল, 'জানিস তো, এত সত্ত্বেও সেসব দেশে কখন-কখন টুমটুমির মত কালাবোবা ছেলেমেয়েদের জন্ম হয়। তখন কিন্তু সে দেশের মায়েদের আমার কাকীমার মত চোখের জল ফেলতে হয় না।'

'কেন, কেন ?'

সেখানে মায়েরা তাদের রেখে আসেন , সরকার পরিচালিত কোন কালাবোবা স্কুলে, যারা তখন তাদের মায়েদেরও সেখানে ভর্তি করে নেন। সেইসব বাচ্চারা বড় হয়ে গেলে, তখন তাদের মায়েরা সেখানে তাদের রেখে যে যার ঘরে কী কাজে ফিরে যান।'

'বলিস কী! এমন খবর পড়ে আমাদের দেশের কালাবোবা ছেলেমেয়েদের মায়েদের চোখে জল তো পড়বেই।'

'ঠিক বলেছিস। আমাদের দেশের কালাবোবারা ভাগ্যক্রমে যদি শহরে জন্মায় আর যদি তার বাবা-মা ধনী হন, তবেই সে এখন আশা করতে পারে মানুষ হওয়ার।'

'আসলে কালাবোবাদের দেখে আমরা অনেকেই এখনও সেরকম বিচলিত হই না, যতটা আমরা বিচলিত হই কানা কী অন্য কোন প্রতিব দেখে।'

'ঠিক বলেছিস। আমি দেখেছি, অনেকেই কালাবোবাদের দেখে হাসেন। তাদের নিয়ে তামাশা করেন।'

'আর সেইজন্যেই দেখবি এখনও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান থেকে ওদের জন্যে তেমন কিছু করা হয় না।'

'সত্যি ?'

'হ্যাঁরে। কাকাবাবু তো হিয়ারিং এড-এর জন্যে অনেক সেবাসংঘের কাছেই আবেদন করেছেন। এখনও তো তাদের কারও কাছ থেকেই কোন উত্তর এল না। কিন্তু এদিকে শুনছি, কানে যন্ত্র দিতে দেরি হলে, ও আর কথা নাও শিখতে পারে।'

'কেন, কেন ?'

'ডাক্তারবাবু বলেছেন, কালাবোবা শিশুদের দুই থেকে চার বছর বয়স কথা শেখার সবচেয়ে ভাল সময়। এই সময়ের মধ্যে, কথা শেখান শুরু না করলে, কালাবোবা শিশুদের কথা শেখার আগ্রহ ক্রমে কমতে থাকে। যা ছ'বছর বয়স থেকে প্রায় শেষই হয়ে যেতে শুরু করে।'

'বলিস কী !'

'হ্যাঁরে। আর সেই জন্যেই তো এখন কাকাবাবু এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। উনি না পারছেন ওকে কোন স্কুলে ভর্তি করতে, না পারছেন কানের যন্ত্র কিনতে।'

'আশ্চর্য ! তাহলে টুমটুমিকে নিয়ে তো দেখছি তোদের দারুণ সমস্যা দাঁড়িয়েছে।'

'হ্যারে। সত্যিই ওকে নিয়ে আমাদের সবারই এখন খুব চিন্তা হয়।'

'আচ্ছা, কবে তোরা ঠিক বুঝতে পারলি, যে টুমটুমি কানে শোনে না ?' ডালিম প্রশ্ন করল।

'প্রথম যখন বোঝা গেল, তখন ও দুবছরের। সবাই বলল, এই সময়ে

সব বাচ্চাই কেমন কথা বলে, টুমটুমি তাহলে কেন কথা বলছে না ?' সন্দেহ হতেই, কাকীমাই প্রথম ওকে একজন ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যান। তিনি নানা পরীক্ষা করে জানান যে, টুমটুমি কানে শোনে না।'

'তারপর ?'

আমিও সেদিন কাকীমার সঙ্গে ছিলুম। ডাক্তারবাবু বললেন যে, কোন বাচ্চাকে নাকি জন্মের পরই চিনে ফেলা যেতে পারে, সে কানে শোনে কী শোনে না।'

'কী করে ?'

ডাক্তারবাবু বললেন, জন্মের পর বাচ্চারা শব্দ শুনে চোখ পিটপিট করে, চমকায়। কোন পরিচিত শব্দ শুনলে, যেমন ধর ঝিনুকবাটি কী মা-বাবার গলার শব্দ পেলে, তারা ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকায়। ছ'মাসের শিশুরা, মাঃ মাঃ, বাঃ বাঃ এইরকম নানা শব্দ করে কথা বলে। নয় থেকে পনের মাসের শিশুরা, দেখা যায়, কথা বলার চেষ্টা করছে। দুবছরে পৌঁছে, প্রায় সব শিশুই ছোটখাট নানান কথা বলতে শেখে। আর তিন বছরের বাচ্চারা তো দস্তুর মতই কথা শিখে যায়। তাই বয়স অনুপাতে, কোন বাচ্চা কম কথা বলছে মনে হলেই, তাদের বাবামায়েদের উচিত কোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা। কারণ যত তাড়াতাড়ি তাদের চেনা যাবে, চিকিৎসার দ্বারা ততই বেশি তাদের উন্নতি হবে।'

'কিন্তু টুমটুমির পক্ষে তো দেখছি ভাল হওয়া খুবই কঠিন ?' ডালিমের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

'হ্যাঁ। ডাক্তারবাবু বলছিলেন, সবচেয়ে ভাল হত যদি ভারতের অন্য প্রদেশের মত, আমাদের এখানেও এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কালাবোবাদের জন্যে শিক্ষক তৈরির কোর্স চালু হয়। যারা পাশ করে, দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, এইরকম সব ছেলেমেয়েদের ভার নিতে পারেন। তখন তাদের উদ্যোগে, কলকাতার বাইরে অনেক স্কুলও গড়ে উঠতে পারে।'

'ঠিক বলেছিস। নানান প্রতীবন্ধীদের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অনেক বড় বড় প্রতিভা। সুযোগ পেলে তারাও হয়তো জেগে উঠতে পারত। তাদের মধ্যে হয়ত কেউ কেউ হয়ে উঠত আমাদের গর্বের পরিচয়। মহান হেলেন কেলারের গল্প পড়েছিস তো ? তিনি ছিলেন কানা, কালা এবং বোবা।'

'এই বাচ্চাটি কী তোমাদের ?' এক ভদ্রলোক হঠাৎ টুমটুমির হাতদুটো ধরে ঝোলাতে-ঝোলাতে নিয়ে এল। ওর সারা গা দিয়ে তখন নর্দমার জল ঝরছে।

'ইস্ কী কাণ্ড ! আমরা গল্প করছি, ওদিকে টুমটুমিটা কখন পালিয়ে গিয়ে নেমে পড়েছে সামনের নর্দমাটায়। ছিঃ ছিঃ।' চুমকি তাড়াতাড়ি টুমটুমিকে কোলে নিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

সঞ্জু-সমুর মারপিট

সেদিন সকালে খেলা করতে-করতে হঠাৎ কী নিয়ে জানি সমু আর সঞ্জুর ঝগড়া বাঁধে। আর তখন সঞ্জু সমুর গালে জোরসে এক থাপ্পড় কষিয়ে দেয়।

সমু তো থাপ্পড় খেয়েই মাটিতে শুয়ে চেঁচাতে শুরু করল। আর তাই শুনে মাধু জ্যাঠাইমা রান্না ঘর থেকে দৌড়ে এলেন।

'আরে একি ! সমুর কান দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে কেন ?' মাধু জ্যাঠাইমা তো তাড়াতাড়ি সমুকে তুলে খাটে শুইয়ে দিলেন। সমুর কান্না শুনে অসিত জ্যেঠুও দৌড়ে এসেছিলেন। তিনি ওই দেখেই ছুটলেন বরফ আনতে।

বিজনবাবু রোজই সকালে বাজার যান অসিত জ্যেঠুর সঙ্গে। তিনি তো ঘরে ঢুকেই অবাক। 'একি ! সমুর আবার সাত সকালে কী হল ?'

'আর বলেন কেন, এরা ভাই বোনে আজ একটা কাণ্ড বাধিয়েছে।' অসিত জ্যেঠু সমুর কানে বরফের সেঁক দিতে দিতে উত্তর দিলেন।

চারুপিসি তখন রান্না ঘরে চা তৈরি করছিল। এইসব গোলমাল শুনেই সে দৌড়ে এসে বলল, 'বৌমা, আমাকে একটু তেল আর রশুন বার করে দাও তো। আমি এক্ষুনি রশুন-তেল বানিয়ে আনছি। দেখবে তা গরম করে ওর ওই কানটাতে ঢেলে দিলেই ওর কানের ব্যথাটা সেরে যাবে।'

চারুপিসির কথা শুনে মাধুজ্যাঠাইমা দৌড়লেন রশুন তেলের জোগাড়

দিতে।

'একি আপনি !' এই সময় হঠাৎ ডাঃ সেনকে ঘরে ঢুকতে দেখে অসিত জ্যেঠু তো অবাক।

'আমি ডাক্তারজ্যেঠুকে ডেকে আনলাম।' পাশ থেকে সঞ্জু উত্তর দিল। আসলে সঞ্জু তো সমুকে দারুণ ভালবাসে। তাই চড় খেয়ে ওর কান থেকে রক্ত বেরুতে দেখেই ও দৌড়েছিল ডাঃ সেনের বাড়ি।

অসিত জ্যেঠুও মনে মনে একজন ডাক্তার ডাকার কথাই ভাবছিলেন। তাই সঞ্জু ঠিক উচিত কাজটা করেছে দেখে উনি বেশ খুশিই হলেন।

'ব্যাপারটা কী ?' ডাক্তার সেন সমুর কাছে এসে দাঁড়ালেন। এইসময় হঠাৎ চারুপিসি রশুন তেল নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

'এ আবার কী !' চারুপিসির হাতে তেলের বাটি দেখে ডাঃ সেন প্রশ্ন করলেন।

'রশুন তেল বাবা।' চারুপিসি মাথায় ঘোমটা টেনে উত্তর দিলেন।

'রশুন তেল ! সে দিয়ে আবার কী হবে ?'

'কানের ব্যথাটা সেরে যাবে।' চারুপিসি বিড়বিড় করে উত্তর দিলেন।

'সে তো জানতুম, আদিম যুগে দেওয়া হত।' ডাঃ সেন চেঁচিয়ে উঠলেন।

'আদিমকালের মানুষের থেকেই তো আমরা সব শিখেছি বাবা।'

'ঠিক ঠিক। তাহলে আপনি মাংস পুড়িয়ে খান না কেন ? আদিম যুগের মানুষরা তো মাংস খেত পুড়িয়ে।'

'পোড়া মাংস কী পেট সইতে পারে ?' চারুপিসি উত্তর দিলেন।

'ঠিক বলেছেন। আমাদের পেট যেমন এখন আর পোড়া মাংস সইতে পারে না, তেমনি আমাদের কানও আর ওই রশুন তেল সইতে পারে না—বুঝলেন।'

ডাঃ সেনের কথা শুনে ঘরশুদ্ধু সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। চারুপিসি তখন তেলের বাটিটা ঠক্ করে টেবিলে বসিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'দেখি মেয়েটার কানে কী হল। শুনে তো মনে হচ্ছে কানের পর্দাটা ফেটেছে।' ডাঃ সেন এবার সমুর পাশে গিয়ে বসলেন। তারপর একটা যন্ত্র দিয়ে কানটা পরীক্ষা করেই চেঁচিয়ে উঠনে। 'যা ভেবেছি তাই।

কানের পর্দাটা দেখছি সত্যি ফেটে গেছে।'

'তাহলে কী হবে?' পাশ থেকে মাধু জ্যাঠাইমা প্রশ্ন করলেন।

'অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কদিন পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন আর নাকে 'এফিড্রিন' ড্রপ দিলেই এইভাবে ফাটা পর্দা আবার জুড়ে যায়। অবশ্য একটা দিকে আপনাদের এখন খুবই নজর রাখতে হবে।'

'কোন দিকে?' অসিত জ্যেঠু প্রশ্ন করলেন।

'দেখবেন, ওর কানে যেন জল-তেল না ঢুকে যায়।'

'তার মানে স্নান করার সময়...'

'না না শুধু স্নান করার সময়েই নয়, এখন সর্বদাই ওর ওই কানটা তুলো দিয়ে বন্ধ করে রাখবেন।'

'কেন ডাক্তারবাবু?'

'বাইরের কান বা শ্রুতি-সুড়ঙ্গে সর্বদাই থাকে নানান রকমের বীজানু। তাই এই অবস্থায় কানে জল কী হাওয়া ঢুকলে তাদের দ্বারা প্রবাহিত হয়ে সেইসব বীজানু শ্রুতি-সুড়ঙ্গ থেকে মাঝের কানে ঢুকে পড়তে পারে। তখন শুরু হবে সেখানে-প্রদাহ। যার পরিণামে দেখা দেবে পুঁজ।'

'বলেন কী!'

'আর পুঁজ হলে তখন কিন্তু ফাটা কানের পর্দা অত সহজে আর জুড়বে না।'

'পুঁজ সারলেও না?'

'হ্যাঁ। পুঁজ সারার পরও তখন দেখা যাবে কানের পর্দার ছেঁদাটা হয়ত রয়েই গেছে।'

'আর যদি প্রদাহ না সৃষ্টি হয়?'

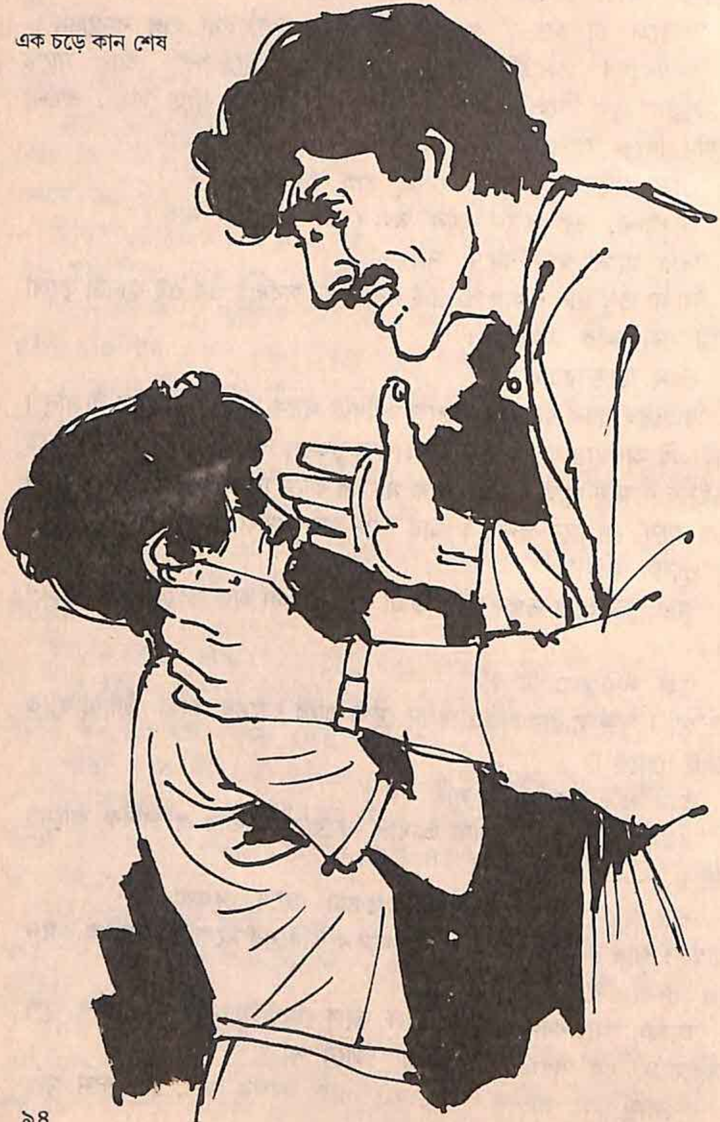
'তখন অধিকাংশ রোগীই আবার ফিরে পায় তার স্বাভাবিক কানের পর্দা।'

'তার মানে, যদি ওই রশুন তেলটা ঢেলে দেওয়া হত...'

'তাহলে আর রক্ষে থাকত না। দেখতেন কদিনের মধ্যেই মেয়েটার কানে পুঁজ দেখা দিয়েছে।'

'আচ্ছা, আজকাল যেসব ভাল ভাল অ্যান্টিবায়োটিক কানের ড্রপ বেরিয়েছে, সে সবও কী দেওয়া চলবে না?'

'বললাম তো, কানের পর্দা ফেটে গেছে, সন্দেহ হলে, সে কানে আর



কোন কিছুই দেওয়া হবে না। সে কানটাকে রাখতে হবে পরিষ্কার তুলো দিয়ে বন্ধ করে।'

'তাহলে ওইসব ইয়ার ড্রপগুলো কখন ব্যবহার করা হয় ? বিজনবাবু প্রশ্ন করলেন।

'ওসব ড্রপ তো দেওয়া হয় কানের প্রদাহজনিত অসুখ সারাতে।'

'বুঝেছি। কিন্তু আপনি সমুর নাকে কেন ড্রপ দিতে বললেন ?' বিজনবাবু আবার প্রশ্ন করলেন।

'নাক আর কানের মধ্যেও যে একটা সংযোগী নল থাকে। যে পথে নাকের সর্দ্দি কী প্রদাহ কানে প্রবেশ করে। শ্রুতি-সুড়ঙ্গের মত নাকেও তো থাকে কিনা নানান বীজানু। তাই এসব ক্ষেত্রে নাকে ড্রপ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। যাতে নাকের সর্দ্দি ইত্যাদি নেমে যায়। মাঝের কানে আর ঢুকতে না পারে।'

'আচ্ছা কান থেকে হঠাৎ রক্ত বেরন মানেই কী পর্দা ফাটা ?' বিজনবাবু আবার প্রশ্ন করলেন।

'না, রক্ত বেরন মানেই এই নয় যে পর্দা ফেটেছে। তবে রক্ত বেরতে দেখলেই সবার উচিত রোগীর সেই কানটা তুলো দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে, তাকে প্রথমে কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া। যাতে তিনি পরীক্ষা করে ব্যাপারটা কী তা বুঝে সেইমত ওষুধের ব্যবস্থা করতে পারেন। কারণ একবার ভুল করে কানে কিছু ঢেলে দিলে, পর্দা যদি সত্যিই ফেটে থাকে, তাহলে সে রোগীটির কিন্তু অযথা কষ্ট বাড়বে।'

'আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি তো বললেন, ঠিকঠাক চিকিৎসা হলে আঘাতজনিত কারণে ফাটাপর্দা আবার জুড়ে যায় অধিকাংশেরই। কিন্তু যাদের তা জোড়ে না ?'

'সে ক্ষেত্রে আপনারা কী করেন ?'

'সে ক্ষেত্রে আমরা তার পর্দাটা অপারেশন করে জুড়ে দিই।'

'সে তো আবার ভারি ঝামেলার ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো উচিত কানের উপর আঘাত এড়িয়ে চলা। [ছবি-৬] কানের উপর থাপ্পড় কী ঘুষি মারা যেমন অন্যায়, তেমনিই অন্যায় কাঠি কী পালক দিয়ে কান খোচানো—অযথা কান পরিষ্কার করার চেষ্টা।' ডাক্তারবাবু নিজের ব্যাগ গুছিয়ে, একটা প্রেসক্রিপশন লিখে উঠে

দাঁড়ালেন।

'আচ্ছা ডাক্তারবাবু, সমুর কানে যদি ব্যথা হয় ?' মাধু জ্যাঠাইমা প্রশ্ন করলেন।

'একটা প্যারাসিটামল জাতীয় ট্যাবলেট দেবেন। এতেই লেখা আছে।' ডাঃ সেন প্রেসক্রিপশনটা অসিত জ্যেঠুর হাতে দিয়ে এগিয়ে পড়লেন।

'আমায় ইন্‌জেকশন দেওয়া হবে না তো ?' ডাঃ সেন বেরিয়ে যেতেই সমু চেঁচিয়ে উঠল।

বুলান কোথায় পেনসিল পায়

বুলান যে কী দারুণ ভাল ছেলে সে তো তোমরা সকলেই জান। যেমন খেলাধূলায়, তেমনি আঁকায়, আবৃত্তিতে। এই তো কদিন আগে নাটক করেও ও একটা মেডেল পেল। আর সেই জন্যেই তোমরা অনেকেই যে বুলানকে মনে-মনে বেশ হিংসা কর, তাও জানি। কিন্তু এই বুলানেরই যে কী দারুণ একটা অসভ্য অভ্যাস আছে তা জান কী ? আমিও কী তাই জানতুম। সেদিন ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখি কী ওর মা খাটে বসে-বসে কাঁদছেন। সামনে বুলানের স্কুল-ব্যাগটা খোলা পড়ে আছে। আমি তো ঘরে ঢুকেই অবাক ! একি ! ঘরে বুলান নেই। অথচ ওর স্কুল-ব্যাগটা নিয়ে বসে-বসে উনি কাঁদছেন কেন ? বুলানের মা আমার প্রশ্নটা শুনেই বললেন, 'আর বলো কেন ভাই, ফের সেই কাণ্ড হয়েছে।'

"কী কাণ্ড ?"

বুলানের মা চোখের জল মুছে বললেন, 'ভেবেছিলাম ব্যাপারটা কোনদিনই কাউকে বলব না। আস্তে-আস্তে বুলানের অভ্যাসটা শুধরে যাবে। তখন কেউই আর জানতে পারবে না। কিন্তু এখন দেখছি তা বোধহয় আর কোনদিই হবার নয়।'

'কী দোষ ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

বুলানের মা বললেন, 'তোমাকে তো কোনদিনই বলা হয়নি। আসলে বুলানের মধ্যে অনেকদিনই একটা বদ দোষ দেখা দিয়েছে। ও স্কুল থেকে রোজই কারও না কারও পেনসিল চুরি করে আনে।'

'সে কী!' আমি তো শুনেই অবাক।

বুলানের মা বললেন, 'তবে আর বলছি কী। আমি কী আর এমনি বসে-বসে কাঁদছি। এই দ্যাখো না, আজও কার জানি একটা পেনসিল চুরি করে এনেছে।' বুলানের মা ওর ব্যাগ থেকে একটা সুন্দর পেনসিল বার করে দেখালেন। 'বুলান এই সময় খেলতে যায়। ভাবলাম, দেখি তো ওর ব্যাগটা খুলে, আজ আবার কারও পেনসিল-টেনসিল আনল কিনা। ওমা! ব্যাগ খুলেই দেখি ঠিক তাই। আজও ফের সেই চুরি করেছে।'

'সে কী! ও রোজ এই কাণ্ড করে নাকি?'

'হ্যাঁ ভাই, এ প্রায় ওর স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।' লক্ষ্য করলাম বুলানের মায়ের চোখ দুটো ফের জলে ভরে উঠেছে। 'গতকালও তো বুলান কার জানি একটা পেনসিল চুরি করে এনেছিল।'

'আশ্চর্য! ও খালি পেনসিলই চুরি করে নাকি?'

'হ্যাঁ, শুধু পেনসিল। আর কোন কিছুতেই ওর লোভ নেই।' বুলানের মা চোখ মুছে বললেন, 'আর এই জন্যে ওর বাবা কাল ওকে কী ঠ্যাঙানই না ঠ্যাঙালেন। কিন্তু এত মার খেয়েও ওর ভয় বা লজ্জা কিছুই হয়নি।'

'বলেন কী! এত দেখছি সত্যি খুব অবাক কাণ্ড!'

'অবাক বলে অবাক। দেখবে ওর কাণ্ডটা।' এই বলে বুলানের মা আলমারির মাথা থেকে একটা সুটকেস পেড়ে আনলেন। সেটা খুলতেই দেখি কী নানান রকম পেনসিলে সুটকেসটা প্রায় ভর্তি!

'এ কী! এত পেনসিল!' আমি তো দেখে হাঁ হয়ে গেলাম। বুলানের মা বললেন, 'সেই যবে থেকে স্কুল যাচ্ছে, তবে থেকেই ওর এই বদঅভ্যাস। প্রথম-প্রথম, লক্ষ্য করতাম, কখন-সখন এর ওর পেনসিল নিয়ে আসে। তখন ঠিক বুঝিনি যে ও তা চুরি করে আনে। কিন্তু এখন তো রোজই আনে। কোন-কোন দিন তিন চারটে পর্যন্ত নিয়ে আসে।'

বুলানের মা আমার জন্যে চা আনতে গেলেন। আমার তখন হঠাৎ বিষ্ণুর কথাটা মনে পড়ে গেল। বিষ্ণু বুলানেরই ক্লাশে পড়ে। ওর মাকেও আমি এইরকমই কাঁদতে দেখেছিলাম। কারণটা যদিও ছিল ঠিক এর

উল্টো। বিষ্ণু নাকি রোজই স্কুলে পেনসিল হারিয়ে আসে। কথাটা ভাবতেই আমার মনের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। বুলান কী তাহলে বিষ্ণুর পেনসিল চুরি করে আনে?

চাটা শেষ করেই ছুটলাম বিষ্ণুদের বাড়িতে। তোমরা তো জান আমার আবার গোয়েন্দাগিরিতে একটু ন্যাক আছে। বুলানের ব্যাপারটা বিষ্ণুদের বাড়িতে চেপে গিয়ে, জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিষ্ণু তোমার কী সেই পেনসিল হারাণ রোগটা বন্ধ হয়েছে?' বিষ্ণুর বাবা বললেন, 'কই আর বন্ধ হল। ও যেমন ক্যাবলা ঠিক তেমনিই আছে। এখন ঠিক আগের মতই মাঝে-মাঝে পেনসিল কী রবার হারিয়ে আসছে। আমি তো এখন ওর জন্যে মাসে এক বাক্স করে পেনসিল কিনে আনি।'

'বিষ্ণুর মাসে এক বাক্স পেনসিল লাগে— বলেন কী? তা কোন কম্পানির পেনসিল কেনেন শুনি?'

'ওই 'ব্ল্যাক বার্ড' পেনসিল' বিষ্ণুর বাবা বেশ বিরক্ত হয়েই উত্তরটা দিলেন। 'ব্ল্যাক বার্ড' পেনসিল তো সবারই চেনা। সব বাচ্চারাই প্রায় ওই পেনসিলটাই ব্যবহার করে। কিন্তু বুলানের বাক্সে যে পেনসিলগুলো দেখলাম তার মধ্যে মাত্র দু একটাই ছিল 'ব্ল্যাক বার্ড'। আর প্রায় সবই দেখলাম অন্য কোন রকমের দামী পেনসিল।

তাহলে? আবার চিন্তায় পড়লাম। এবার বিষ্ণুকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, স্কুলে তোমার পাশে কে বসে?' বিষ্ণু বলল, 'তার কী কোন ঠিক আছে। এক-একদিন এক-একজন বসে।' ফের অবাক হলাম। তাহলে যা ভেবেছিলাম, তা তো নয়। আবার বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা তোমার মত কী আর কারও পেনসিল হারায়, না তুমি একলাই রোজ পেনসিল হারাও।'

বিষ্ণুবলল, 'আমি একলা কেন, সবাই তো হারায়। কেউ পেনসিল হারাচ্ছে, কেউ বা বই কী রবার হারাচ্ছে।'

বিষ্ণুর বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, এটা অবশ্য সত্যি কথা যে ওর ক্লাশে সব কটাই প্রায় ওর মতই বুদ্ধু।'

বিষ্ণুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভাবতে-ভাবতে রাস্তা হাঁটছিলাম। বারবারই তখন বুলানের বাবার কথাটা মনে পড়ে যাচ্ছিল। উনি বলছিলেন, 'আর কদিনের ভেতর ওকে শোধরাতে না পারলে আমি বাড়ি

ছেড়ে পালাব। আমার তো ওই একটাই ছেলে। সেও যদি চোর হয় তাহলে সে লজ্জা রাখব কোথায় বল তো ?' কিন্তু বুলানকে শোধরানই বা যাবে কী ভাবে ? নানান কথা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ আমার এক ডাক্তারবন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম, তাকে জানালে বোধহয় ব্যাপারটার কোন সুরাহা হতে পারে।

পরের দিনই গেলাম আমার সেই ডাক্তারবন্ধুর কাছে। তিনি সব শুনে-টুনে বললেন, 'এটা নাকি একরকমের মানসিক ব্যাধি, যার নাম ক্লিপটোম্যানিয়া বা গুপ্ত চৌর্যবৃত্তি। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে কোন সাইকোলজিস্ট অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিকের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।' বললাম, 'ঠিক আছে, আমি না হয় কালই বুলানকে নিয়ে কোন মানসিক রোগের চিকিৎসকের কাছে যাব। কিন্তু ডাক্তার হিসাবে তুমিও নিশ্চয়ই আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে কেনই বা এক-একজন বাচ্ছার মধ্যে এইরকম অসভ্য ইচ্ছার উদয় হয়।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ সেটা অবশ্যই শোনার মত। জান তো, প্রাণী জগতে মানুষই হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব, আর মানুষ সেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তার বুদ্ধির দ্বারা ?'

'তার মানে তুমি বলছ, প্রাণীজগতের ক্রমবিবর্তনের ফলে মানুষের শুধু চেহারাটাই পাল্টায়নি তার ব্রেনটারও দারুণ উন্নতি ঘটেছে ?'

'ঠিক তাই। আর সেইজন্যেই পশুদের মত কামড়ান-আঁচড়ান কী চুরি-মারপিট ইত্যাদি জঘন্য কাজগুলো করতে মানুষের বিবেচনায় বাধে।'

'কিন্তু এরকম মানুষও তো দেখা যায় যে প্রায়ই অমানুষ বা পশুদের মত ব্যবহার করছে ?' আমি ফের প্রশ্ন করলাম।

'খুব-খুব।' ডাক্তারবাবু বললেন'এর কারণ আমাদের কারও-কারও মধ্যেই সেইসব আদিম পাশবিক প্রবৃত্তিকে সুপ্ত অবস্থায় দেখা যায় বলে।'

'কিন্তু কেন ? তারা যখন আকৃতিতে মানুষের মতই, তাহলে তাদের প্রবৃত্তিটা কেন মানুষের মত হল না ?'

তিনি বললেন,'জান তো, মানুষের শরীরের সব কাজ, ইচ্ছে-অনিচ্ছে পরিচালিত হয় ব্রেনের দ্বারা ? ব্রেন-ই হল মানুষের শরীরের হেডঅফিস। আর ওই সব ভিন্ন-ভিন্ন কাজের জন্য ব্রেনের মধ্যে থাকে ভিন্ন-ভিন্ন সেন্টার বা কেন্দ্র। যেমন দেখার জন্যে, শোনার জন্যে, ঘুমনোর জন্যে ইত্যাদি।'

'তাহলে কী তুমি বলছ, চুরি করার জন্যে, মারপিট বা খুন করার জন্যেও

মানুষের ব্রেনের মধ্যে কেন্দ্র থাকে ?' আমি ফের প্রশ্ন করলাম।

'নিশ্চয়।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'এককথায় আদিম প্রবৃত্তিগুলো চরিতার্থ করার ইচ্ছেটা জাগে মানুষের ব্রেনের 'টেম্পোরাল লোব' বা খণ্ড থেকে।'

'সে আবার কী ?'

তিনি বললেন,'ব্রেনের মধ্যে আগেই বলেছি যেমন নানান কেন্দ্র থাকে, তেমনি মানুষের ব্রেন নানান খণ্ডেও বিভক্ত থাকে। যেমন টেম্পোরাল খণ্ড, ফ্রন্টাল খণ্ড, প্যারাইটাল খণ্ড, অকসিপিটাল খণ্ড। টেম্পোরাল খণ্ডে যেমন আদিম প্রবৃত্তির বাসা বা কেন্দ্র আছে, আবার ফ্রন্টাল খণ্ডের সম্মুখ ভাগেও তেমনি একটি কেন্দ্র আছে যে টেম্পোরাল খণ্ডের ঐ জঘন্য কেন্দ্রটিকে কড়া শাসনে রাখে। এখন যদি কারও ব্রেনের ফ্রন্টাল খণ্ডের কেন্দ্রটি কিছু কমজোরি হয় তাহলে তারমধ্যে আদিম প্রবৃত্তিগুলো সহজেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, ফলে তখন সে অমানুষ বলে প্রতিপন্ন হয়। তখন তার দ্বারা খুন, জখম, চুরি সবই করা সম্ভব। প্রকারান্তরে এ কথাও বলা যেতে পারে ফ্রন্টাললোবের ওই কেন্দ্রটি যার যত জোরাল তার মধ্যেই মানসিক বোধশক্তি তত বেশি বিরাজ করবে।'

'তাই নাকি ? এ খুব অদ্ভুত ব্যাপার তো !' আমি সব শুনে-টুনে সত্যিই খুব অবাক হলাম।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'এটা সত্যিই খুব অদ্ভুত ব্যাপার। আমরা সকলেই মানুষের মত দেখতে হয়েও স্বভাবে আমরা সবাই মানুষের মত নাও হতে পারি। এই জন্যেই তো পৃথিবীতে এত অশান্তি।'

পরের দিনই আমি বুলানকে নিয়ে ডাঃ বোসের কাছে গেলাম। তিনি সব শুনে বললেন, 'হ্যাঁ, বুলানের চুরি করাটা সত্যিই একটা মানসিক ব্যাধি। যা নিশ্চয়ই সারিয়ে তোলা যেতে পারে, যদি জানা যায় কেন ওর মনের মধ্যে চুরি করার ইচ্ছাটা জাগল।'

বুলানের বাবা বললেন, 'আমরাও তো এখন সারাদিনই ওই একই চিন্তা করি।'

ডাক্তার বোস বললেন, 'ঠিক আছে আমি নাহয় একটা উদাহরণ দিয়ে আপনাদের বোঝাবার চেষ্টা করতে পারি, কী করে একটি শিশুর মধ্যে চুরি করার প্রবৃত্তি জাগতে পারে। সেটা শোনার পর হয়তো আপনাদের

ভাবতে সুবিধে হবে বুলান কেন তাহলে চুরি করছে।' আমরা সবাই এগিয়ে বসলাম। তখন ডাক্তার বোস আমাদের একটা গল্পের মত উদাহরণ দিলেন। বললেন, 'ধরুন, একজন শিশু খুব খেতে ভালবাসে। তার রোজই খেতে বসে আর-একটু বেশি খাবার ইচ্ছে হয়। কিন্তু তার মা তাকে স্নেহ করেন না বলেই হোক, কী সংসারের অভাবের কারণেই হোক, তাকে তার ইচ্ছা মত খেতে দিতে পারেন না। ফলে রোজই তার ইচ্ছাটা অপূর্ণ থেকে যায়। তাই একদিন তার সেই আদিম প্রবৃত্তি তাকে চুরি করার বদ্‌ইচ্ছে জোগাবে।'

'তাই নাকি ! তার মানে আপনি বলছেন তখন সে কেড়ে-কামড়ে কী চুরি করে খাবার চেষ্টা করবে ?'

'ঠিক তাই। প্রথমে অন্যের ভাগ থেকে কেড়ে খাবার চেষ্টা করবে। তাতে বাধা পেলে চুরি করে খাবার কথা ভাববে। বাড়িতে চুরি করার সুবিধা না থাকলে অন্য কোথাও গিয়ে সে তার ইচ্ছে মেটাবার চেষ্টা করবে।'

'আশ্চর্য !' বুলানের বাবার গলা থেকে কথাটা অস্ফুটভাবে বেরিয়ে এল। ডাঃ বোস বললেন, 'আসুন, এবার বুলানের কথায় ফিরে আসা যাক্। আপনারা কী কখন ওকে ওর ছেলেবেলায় পেনসিল পাবার ইচ্ছে থেকে বঞ্চিত করেছিলেন ?'

'ঠিক-ঠিক।' বুলানের বাবা বললেন, 'এবার আমার সব মনে পড়ে যাচ্ছে।' হঠাৎ আমাকে তিনি ইশারায় জানালেন বুলানকে নিয়ে বাইরে যেতে।

আমি বুলানকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেই উনি ডাঃ বোসকে বললেন, 'জানেন, বুলানের মা ছোটবেলায় ওকে কখনই কিছু পেতে দিতেন না। একটা বই কী পেনসিল কী খেলনা কিছুক্ষণের জন্যে ওর হাতে দিয়েই সেটা তিনি নষ্ট হওয়ার ভয়ে ফের ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতেন। ফলে ওছোটবেলায়ওইসব জিনিস আরও কিছুক্ষণ বেশি করে পাবার জন্যে ঘন-ঘনই বায়না করত।'

ডাঃ বোস বললেন, 'আর সেই আগ্রহকে মেটাবার জন্যেই ও স্কুলে গিয়ে অপরের জিনিস চুপি-চুপি সরিয়ে নিজের কাছে রেখে দিত।'

বুলানের বাবা বললেন 'জানেন ডাক্তারবাবু ওর চুরি করার আসল

কারণটা বুঝতে না পেরে কতবারই আমি ওকে অকারণে বেধরক মেরেছি। অথচ কিছুতেই ওর চুরির রোগ বন্ধ করতে পারিনি। মাঝে-মাঝে মনে হয়, ব্যাপারটার ওপর ওর যেন কোন কন্ট্রোলই নেই।'

'হ্যাঁ' ডাঃ বোস বললেন, 'সত্যিই এসব প্রবৃত্তি সাধারণত রোগীর কন্ট্রোলের বাইরে থাকে।'

'এখন তাহলে কী উপায়ে ওকে শোধরান যেতে পারে ?' বুলানের বাবা জানতে চাইলেন।

ডাঃ বোস বললেন, 'এবার থেকে ওকে ওইভাবে শাসন না করে তার চেয়ে বরং ওকে রোজ অঢেল পেনসিল-টেনসিল নিয়ে থাকতে দিন। সব কিছুর মধ্যে বোধহয় ওর পেনসিল চুরি করে আনাটাই সহজ বলে মনে হয়েছে। তাই পেনসিল চুরি করেই ও ওর সুপ্ত ইচ্ছাটা চরিতার্থ করে। প্রচুর পেতে পেতে দেখবেন একদিন আসবে যখন ওর আর ওইসব পাবার তেমন আগ্রহই থাকবে না। তখন ও আপনিই চুরি করা ছেড়ে দেবে।'

'বাঃ, ভাবতেও ভাল লাগছে যে আমার ছেলের ঐ জঘন্য অভ্যাসটা শুধরে যাবে।' বুলানের মায়ের চোখ দুটো আবার জলে ভরে উঠল। ডাঃ বোস বললেন, 'এবার থেকে কিন্তু ওর কোন চাহিদাকেই আর আপনি অপূর্ণ রাখবেন না, কেমন ?'

'কিন্তু, তা যদি কোন অন্যায় চাহিদা হয়, যা কখনই দেওয়া সম্ভব নয় বা উচিত নয় ?'

'সেরকম অন্যায় চাওয়া অবশ্য শিশুরা কখন-সখনই চাইতে পারে যা নিশ্চই কড়া শাসনের দ্বারাই মোকাবিলা করা উচিত। কিন্তু নিত্যই ওদের সুপ্ত মন অনেক কিছুই পেতে চাইবে যেমন খাবার-দাবার, খেলনা, আদর-টাদর। সে সবই ওদের দিতে হবে যথাসম্ভব। তা নাহলেই ওরা হয়ে উঠবে অস্বাভাবিক, অসভ্য। আর হ্যাঁ, শিশুদের সামনে এমন কোন কাজই বড়দের করা উচিত নয়, যা ওদের করা অন্যায়।'

'যেমন ?' বুলানের বাবা ফের প্রশ্ন করলেন।

'যেমন ধরুন, আপনি রোজ যদি ওদের দেখিয়ে-দেখিয়ে সিগারেট খান তাহলে জানবেন, বড় হবার অনেক আগেই ওদের সিগারেট খেতে ইচ্ছে হবে। যাক্—আজ এই অবধিই থাক। সব তো আর উদাহরণ দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। তাছাড়া বাইরে এখন অনেক পেসেন্ট অপেক্ষা

করছেন। তারা বোধহয় এতক্ষণে অধৈর্য হয়ে পড়েছেন।'

ঠিক ঠিক।' আমরা ডাক্তারবাবুকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরে গেলাম।

পূবালী তোতলাচ্ছে

সেদিন হয়েছে কী, পূবালী ওর কুকুর ছানাটাকে নিয়ে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় হঠাৎ সেটা হাত ফস্‌কে সোজা নিচে রাস্তার ওপর আছড়ে পড়ে। ইস্‌, সে কী কাণ্ড।

রত্নামাসি তখন বাথরুমে ছিলেন। উনি স্নানটান সেরে বারান্দায় গিয়ে দেখেন কী পূবালী বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে নিচে কী যেন দেখছে।

'কী হল, তুমি অত ঝুঁকছ কেন ?' রত্নামাসী তো পূবালীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েই অবাক।

'ওমা এ কী! টুসি পড়ে গেছে ?'

উনি তো সঙ্গে সঙ্গে পড়ি-কী-মরি করে নিচে দৌড়লেন। কিন্তু তার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে। ওইটুকু কুকুর অত উঁচু থেকে পড়ে কী বাঁচে ?

টুসি মরে গেছে শুনে পূবালীর বাবা, দাদু, দিদা তো সবাই দারুণ ভেঙে পড়লেন। কিন্তু টুসিকে নিয়ে খুব বেশিক্ষণ আর ওদের চিন্তা করতে হল না। তার আগেই পূবালীকে নিয়ে আর এক ঝঞ্ঝাট শুরু হল। সেদিন বিকালেই সবাই লক্ষ্য করল, পূবালী কথা বলতে গেলেই তোতলাচেছ।

'এ আবার কী ?' তাপসমেসো তো খুব অবাক হলেন।

রত্নামাসী বললেন, 'পূবালী কী তবে টুসিকে অমন করে মরে যেতে দেখে ভয় পেল ?' পূবালীর দাদু বললেন, 'তোমরা এক্ষুনি ওর মামাকে ডেকে পাঠাও। সে ওকে কোন ডাক্তার দেখিয়ে আনুক। তার তো শুনেছি অনেক ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ আছে।' পূবালীর দেবুমামা তো খবর পেয়েই দৌড়ে এলেন। তারপর সব শুনেটুনে বললেন, 'কিন্তু তোতলামির

জন্যে কোন ডাক্তার দেখাতে হয় সে তো জানি না। দাঁড়াও আগে খবর নিই।' এই বলেই উনি ওঁর এক ডাক্তার বন্ধুকে ফোন করলেন। তিনি সব শুনেটুনে বললেন, 'তুমি এক্ষুনি ওকে কোন সাইকোলজিস্টকে দেখাও। এ সব রোগীকে প্রথমেই সাইকোলজিস্টকে দেখান উচিত।'

দেবুমামা সেদিনই পূবালীকে নিয়ে এক সাইকোলজিস্টের কাছে গেলেন। সঙ্গে গেলেন রত্নামাসী আর তাপসমেসো।

ডাক্তারবাবু সব শুনে বললেন, 'পূবালীর বয়স কত?'

'সাত।'

'সা-ত। তাহলে তো যা ভাবছিলাম তা নয়।'

'আপনি কী ভাবছিলেন?' দেবুমামা জানতে চাইলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'বাচ্চারা যখন নতুন কথা বলতে শেখে তখন স্বাভাবিক কারণেই ওরা একটু আধটু তোতলায়। যা তারা বড় হয়ে শুধরে নেয়। এক্ষেত্রে কারণটা মনে হয় তা নয়। তাছাড়া ওর তোতলামিটা শুনলাম শুরু হয়েছে হঠাৎ ওর প্রিয় কুকুরটাকে অমন ভাবে মরে যেতে দেখে। তাই মনে হয় এক্ষেত্রে ওর তোতলামিটার কারণ আকস্মিক মানসিক আঘাতজনিত।'

'সেটা কী সারে না?' রত্নামাসী পাশ থেকে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আসলে অধিকাংশ তোতলামির কেসই তো চট্ করে সারতে চায় না। তাই তোতলা রোগীদের দেখলেই আমরা একটু ভাবনায় পড়ি।

'কেন, তোতলারা সারতে চায় না কেন?'

'কারণ ওইসব রোগীদের শুরুতে অন্য কোন কষ্ট থাকে না বলে কেউই ওদের চিকিৎসার আওতায় আনতে তেমন গা করেন না। অথবা যাহোক-তাহোক কোন চিকিৎসা করান। ফলে চিকিৎসা পেতে দেরি হয়ে কেসগুলো এমনই বিগড়ে যায় যে আমরা তখন আর কিছুতেই ওদের চট্‌পট্ সারিয়ে তুলতে পারি না।'

'কিন্তু পূবালীকে তো আমরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।'

'হ্যাঁ সেইজন্যেই তো আশা করা যায় যে ও সেরে উঠবে।'

এই বলে ডাক্তারবাবু একটা ওষুধ লিখে দিয়ে বললেন, 'নিন, এই

ওষুধটা ওকে রোজ খাওয়াবেন। দুচামচ সকালে, দুচামচ রাত্রে। মোট দু সপ্তাহ। তারপর আবার ওকে নিয়ে আসবেন।'

'কিন্তু ওর এমন হল কেন ডাক্তারবাবু?' দেবুমামা প্রশ্ন করলেন।

'বাইরে এখন প্রচুর রোগী অপেক্ষা করছেন। আপনারা বরং কোন রবিবার সকালবেলা আসবেন। সেদিন আপনার ওই প্রশ্নের জবাব দেব—কেমন।'

ডাক্তারবাবুর কথা শুনে ওরা সবাই সেদিনের মত পূবালীকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

সুখের কথা, ডাক্তারবাবুর ওষুধ খেয়ে পূবালী দু সপ্তাহের আগেই সেরে গেল। দেবুমামা কিন্তু দু সপ্তাহ বাদে পূবালীকে নিয়ে ফের ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেন। কে জানে, ফের যদি পূবালীর তোতলামি শুরু হয়।

পূবালী সেরে গেছে শুনে ডাক্তারবাবু দারুণ খুশি হলেন। তখন দেবুমামা বললেন, 'আজ তাহলে তোতলামির কারণ সম্বন্ধে আপনি আমাদেব কিছু বলুন।'

'বেশ তাহলে বলি শুনুন। ব্যাপারটা কিন্তু খুবই জটিল। মন দিয়ে শুনবেন—কেমন।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'লক্ষ্য করবেন, তোতলামিতে আক্রান্ত হয় সাধারণতই লাজুক এবং ভিতু প্রকৃতির ছেলেমেয়েরা। তারা মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে মিশতেও কেমন যেন অপারগ। অনেক সময় আবার কোন-কোন বাচ্চার তোতলামি শুরু করার পেছনে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য থাকে। অর্থাৎ তারা তোতলামি শুরু করতে এবং তা চালিয়ে যেতে চায় তাদের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে।'

'কিন্তু তোতলামিটা হয় কেন?'—দেবুমামা প্রশ্ন করলেন।

'তোতলামি হয় কেন সেকথাটা বুঝতে হলে প্রথম বুঝতে হয় আমরা স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে শিখি কী ভাবে।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনারা জানেন কী আমরা কী ভাবে কথা বলতে শিখি?'

ওদের সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে, ডাক্তারবাবু নিজেই প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে দিলেন। 'আমরা কথা বলতে শিখি, কানে শুনে। অর্থাৎ কথা বলতে শেখার জন্য প্রয়োজন ভাল ভাবে কানে শুনতে পাওয়ার। তাই যে জন্ম থেকেই কালা, সে পরে বোবা হয়। এবারে আসুন, একজন শিশু যে কানে ভাল শুনতে পায়, সে কী করে কথা বলতে শেখে, সে

বিষয়ে আলোচনা করা যাক্। আমরা শিশুদের কথা বলতে শেখানোর জন্য, তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে কত কথাই না বলি—তাই না ?'

'ঠিক-ঠিক।' দেবুমামা ঘাড় নাড়লেন।

'শিশুরা সেইসব কথা শোনে তাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এবং মনে মনে সেই সব কথার একটা মানে তৈরি করে নেয় তাদের ব্রেনের সাহায্যে। জানেন নিশ্চয়, আমাদের ব্রেনে প্রত্যেক কাজের জন্য আলাদা আলাদা দফতর বা সেণ্টার আছে ?'

'শুনেছি।' তাপসমেসো উত্তর দিলেন।

আচ্ছা, এবার তাহলে একটা উপমা দিই। ধরুন ঘরে একটা বেড়াল ঢুকল। আপনি অমনি আপনার ছেলেকে দেখিয়ে বললেন, ওই দ্যাখো, ম্যাও এসেছে। ম্যাও-ম্যাও। ছেলেটি লক্ষ্য করে, ওই প্রাণীটি ঘরে ঢুকলেই আপনি অমন ম্যাও-ম্যাও করেন। ফলে সে বুঝতে পারে ওই প্রাণীটি হল 'ম্যাও'। তখন সে চেষ্টা করে ওই ম্যাও শব্দটিকে তার ব্রেনের স্মৃতি কেন্দ্রে ধরে রাখার। সেই সঙ্গে সে তার স্মৃতিকেন্দ্রে ওই প্রাণীটিকে ম্যাও বলতে কীভাবে ঠোঁট মুখ নাড়তে হবে তাও ধরে রাখে। স্মৃতিকেন্দ্র ছাড়াও শিশুরা তাদের যত অভিজ্ঞতা তা তারা জমা রাখে ব্রেনের প্যারাইট্যাল খণ্ডের 'এ্যাঙ্গুলার জাইরাস' নামক আর একটি স্থানে। এই এ্যাঙ্গুলার জাইরাস শুধু অভিজ্ঞতাকেই জমা রাখে না, সেই সঙ্গে সে শিশু যত শব্দ শোনে বা দৃশ্য দেখে তাদের প্রত্যেকের প্রকৃত অর্থও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। এই এ্যাঙ্গুলার জাইরাস, কোন কিছুর অর্থ বিশ্লেষণ করার পর সে ব্রেনের আর একটি সেণ্টারকে স্পন্দিত করে, যার নাম 'আইডিওমটোর সেণ্টার'।

'বাবাঃ, নামটা বেশ কঠিন তো। ওই আইডিও মোটর সেণ্টার না কী বললেন যেন, ওর কাজ কী ?' রত্নামাসি প্রশ্ন করলেন।

'আমরা কান দিয়ে যা শুনি বা চোখ দিয়ে যা দেখি সেইসব দেখেশুনে কী করা উচিত, আইডিও মটোর সেণ্টার তার আজ্ঞা দেয়।'

'তার মানে,' দেবুমামা বললেন, 'বাঘ দেখে যে পালাতে হবে...'

'ঠিক ধরেছেন।'

'তাহলে এবার বুঝতে পেরেছি বাচ্চা কী ভাবে কথা শেখে। প্রথমে সে কানে শোনে প্রাণীটার নাম ম্যাও। সেই সঙ্গে সে তার দৃষ্টিকেন্দ্রের দ্বারা

লক্ষ্য করে কী করে ম্যাও শব্দটা উচ্চারণ করতে হবে। এসবই সে তার স্মৃতিকেন্দ্রে জমা রাখে। এইবার একদিন তার আইডিও-মটোর সেণ্টার তাকে অনুপ্রাণিত করে প্রাণীটাকে ম্যাও বলে ডাকতে। যখন সে একদিন হঠাৎ ম্যাও বলে ওঠে। এই তো?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন বটে, তবে ব্যাপারটা ঠিক অত সহজে ঘটে না।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'কিছু বলতে চেয়ে আমরা তা বলতে সফল হই কী করে এবার সেটাই আমি আপনাদের বলব।

'আসলে আইডিও মটোর বা ভাবচালক কেন্দ্র থেকে কথাটা উচ্চারণ করার আজ্ঞা সোজাসুজি মুখের পেশীতেই চলে যায় না। কারণ মনের ভাব তো আমরা শুধু কথাতেই প্রকাশ করতে চাই না। কোন ভাব আমরা প্রকাশ করি লিখে, কোন ভাব ইশারায়। তাই আইডিও-মটোর বা ভাবচালক কেন্দ্র থেকে যে ভাবটাকে আমরা যে ভাবে প্রকাশ করতে চাইছি সেই অনুসারে আজ্ঞাটি প্রথম সেই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। যেমন কথা বলে ভাব প্রকাশ করতে চাইলে ভাবচালক কেন্দ্র থেকে স্পন্দন চলে যাবে ব্রোকাস কেন্দ্রে, লিখতে চাইলে তা চলে যাবে রাইটিং বা লিখন কেন্দ্রে ইত্যাদি।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ, সেইখানে তখন যে স্পন্দনটি জাগবে সেটি তখন নিজস্ব পিরামিডাল স্নায়ুপথ ধরে চলে যাবে তার আপন কর্মক্ষেত্রে। অর্থাৎ কথা বলতে চাইলে ব্রোকাস কেন্দ্র থেকে স্পন্দন দৌড়ে যাবে মুখের, জিভের, চোয়ালের কী তালুর পেশী সমষ্টিতে। লিখতে চাইলে স্পন্দন চলে যাবে আঙ্গুলের পেশীগুলিতে ইত্যাদি। তারা তখন স্পন্দিত হয়ে আপন আপন কাজ করবে।'

'অর্থাৎ শিশুটি এবার ম্যাও বলে ডেকে উঠবে।'

'না-না। প্রথমেই সে বড়দের মত স্পষ্ট করে ম্যাও বলতে পারবে না। শুরুতে সে আধো আধো ভাষায় চেষ্টা করতে করতে শেষে একদিন সে বড়দের মত বলতে পারবে।'

'অর্থাৎ হাঁটা শিখতে চেয়ে বাচ্চাদের যা দশা হয়।'

'ঠিক-ঠিক। প্রথম বার বার আছাড় খেয়ে তবে শিশুরা হাঁটতে শেখে।'

'আচ্ছা ডাক্তারবাবু, কথা বলায় আটকালে যেমন তাকে তোতলামি

বলে তেমনি কেউ একদম কথা বলতে না পারলে তাকে কী রোগ বলে ?'

সে রোগের নাম অ্যাফাসিয়া। অ্যাফাসিয়া বা বাক্‌শক্তি-হীনতা দুরকমের। এক, রোগী শুনতে পায়, কিন্তু বুঝতে পারে না যা শুনছে তার কী মানে। আর তাই সে কথাটা শিখতে পারে না। একে বলে, 'সেনসারি অ্যাফাসিয়া'। আর দুই—রোগী ভালই শুনতে পায়, বুঝতেও পারে কিন্তু সে তা মুখে বলতে পারে না। তাকে বলে—মটোর অ্যাফাসিয়া।

'সেনসারি অ্যাফাসিয়া হয় ব্রেনের টেম্পোরাল, প্যারাইটাল অথবা অকসিপিটাল খণ্ডের কোন রোগের কারণে। কারণ ব্রেনের ওইসব স্থানগুলিতেই যথাক্রমে শ্রবণ, এ্যাঙ্গুলার জাইরাস এবং দৃষ্টিকেন্দ্র অবস্থিত। আর মটোর অ্যাফাসিয়া হয় ব্রেনের ফ্রন্টাল খণ্ডের ব্রোকাস কেন্দ্রের কোন রোগের কারণে।'

'আমরা কথা বলতে শিখি কী ভাবে, কথা বলার অসুবিধা কতরকমের হতে পারে এবং সেইসব অসুবিধার কারণ ব্রেনের কোথায় অবস্থিত থাকে সে বিষয়ে তো সব জানলাম কিন্তু তোতলামি কেন হয় তা তো এখনও বললেন না ?'

'হ্যাঁ, এবার সেই কথাটাই বলব। ওই যে তখন আপনাদের আইডিও-মটোর সেণ্টারের কথা বললাম, যা আমাদের কী দেখেশুনে কী করা উচিত সেইসব আজ্ঞা দেয়, সেই আইডিও-মটোর সেণ্টারকে সদাই কড়া-শাসনে রাখে ব্রেনের প্রি-ফণ্টার খণ্ড। মনে করুণ, এক মাসটারমশাই তার এক ছাত্রকে খুব ঠ্যাঙায়। তাই সেই ছাত্রটির ইচ্ছে হয় তিনি ক্লাশে এলেই বলতে, 'এই মাস্টার ভাগ।' অমনি তখন তার ব্রেনের প্রি-ফণ্টার খণ্ড তার আইডিও-মটোর কেন্দ্রকে শাসন করে, "ছিঃ, গুরুজনকে কক্ষনো অমন কথা বলতে নেই।" সেই আজ্ঞা পালন করে তখন তার আইডিও-মটোর সেণ্টার ইচ্ছে হলেও অমন কথা না বলে, মনের ইচ্ছেকে চেপে রেখে, সে তখন বলবে যা তার বলা উচিত। অর্থাৎ,"নমস্কার স্যার।"

'কিন্তু কখন-কখন ঘটনাটা অমন সুষ্ঠুভাবে নাও ঘটতে পারে। ধরুন আইডিও-মটোর কেন্দ্র একটা-কিছু বলতে চাইছে। তখন প্রি-ফ্রণ্টার খণ্ড আজ্ঞা করল, না, ওসব বলতে হবে না। বক্তা তখন আমতা-আমতা করতে শুরু করে দেয়। একবার ভাবে বলি, আবার ভাবে না বলব না।

অর্থাৎ কিনা তার মধ্যে তখন দ্বিধা উপস্থিত হয়।'

'ওঃ বুঝেছি। কী বলবে বুঝতে না পেরে তখন সে তোতলাতে শুরু করে।'

'ঠিক। ধরুন যাচ্ছেন সিনেমায়। হঠাৎ পথে বন্ধু প্রশ্ন করল, কোথায় চললে ? আপনি ভাবলেন, সত্যি কথাটাই বলা যাক। হঠাৎ তখন আপনার প্রি-ফ্রন্টার খণ্ড বাধ সাধল। সে বলল, না না সত্যি বলে দরকার নেই। যদি ও সঙ্গে যেতে চায় তখন কিন্তু অনেকগুলো পয়সা বেরিয়ে যাবে। তাই আপনি তখন সি-সি-সি বলে বসলেন, সি-সি-সিধে, বা-বা-বাজারে।'

'ঠিক বলেছেন।' দেবুমামা হেসে বললেন, 'এরকম স্বাভাবিক তোতলামি তো দিনের মধ্যে আমাদের সবারই হাজার বার হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, নতুন কথা শেখার সময় বাচ্চাদেরও এরকম স্বাভাবিক তোতলামি হয়। কারণ তখন তারা ঠিক করে উঠতে পারে না, কোনটা বলা ঠিক হবে। মাকে মাও বলতে শিখেছে, মামিও বলতে শিখেছে আবার মামণিও বলতে শিখেছে। ফলে মাকে দেখে তখন সে আমতা-আমতা করে। বুঝে উঠতে পারে না কোনটা বলে ডাকবে। একটু বড় হবার পর, যখন তারা নিজের ইচ্ছের কী মতের সম্বন্ধে আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে, তখন আর তারা অমন আমতা-আমরা করে না।'

'হ্যাঁ, একথা তো আপনি প্রথম দিনই বলেছিলেন। আর সেইজন্যেই সেদিন আপনি পূবালীর বয়সটারও খোঁজ করছিলেন।'

'ঠিক বলেছেন।'

'কিন্তু তারা কেউ কেউ পাকাপাকি ভাবে তোতলা হয়ে যায় কেন ?'

'হ্যাঁ, সেটাই এবার বলব। আপনারা জানেন নিশ্চয়, বাচ্চাদের জীবনে অনেককিছুই ঘটতে পারে, যা তাদের মনে ভয় বা আতঙ্ক জাগায়। যেমন ধরুন একটি বাচ্চার মা তাকে ছেড়ে চলে গেল বা মারা গেল। সে তখন মাকে কাছে চেয়েও আর পাচ্ছে না। অথবা ধরুন কোন বাচ্চার মা কী বাবা ভীষণ রাগী। বাচ্চা তাকে ভয় পাচ্ছে। সে যা করে তাতেই মার খায়। ফলে সে বিভ্রান্ত বোধ করছে। সে ভীতু হয়ে উঠছে। সে বুঝতে পারছে না, কী করলে সে অমন মার-ধোর খাবে না। অথবা ধরুন, কোন বাচ্চার মা তার ছোট ভাই কী বোনকে হঠাৎ বেশি ভালবাসতে শুরু করলেন। তা

সে ছোট বলেই হোক, অথবা তার কোন অসুখের কারণেই হোক। ফলে বড়টি এখন তার মাকে আর আগের মত বেশি করে পাচ্ছে না। ফলে তার ধারণা হতে শুরু করল, মা বুঝি তাকে অবহেলা করছে। সে তখন মনে মনে দ্বিধাগ্রস্ত বা স্পর্শকাতরতায় ভুগতে আরম্ভ করল। ফলে, তার ছোট ভাই কী বোনের চেয়ে বেশি করে মাকে কাছে পাবার প্রতিযোগিতায় যেতে চেয়ে, এবং মায়ের সহানুভূতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়ে সে তখন অনেক কিছুই করতে পারে। যেমন ধরুন তোতলাতে পারে, অথবা শিশুকালের মতো নতুন করে বিছানা ভেজাতে কী বোতল চুষতে চাইতে পারে। অর্থাৎ ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মায়ের ভালোবাসা পাবার প্রতিযোগিতায় জিততে চেয়ে সে তখন আবার ছোট সাজার চেষ্টা করে।'

'ও, এবার মনে পড়েছে। আপনি যে শুরুতে বলেছিলেন, তোতলামি করার পেছনে অনেক সময় অনেক বাচ্চাদেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে, এইসব হচ্ছে তাহলে সেইসব উদ্দেশ্য ?'

'ঠিক বলেছেন। আর একবার তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলে, অর্থাৎ আবার মাকে আগের মতো বেশি করে কাছে পেতে শুরু করলে, মাকে আবার যাতে না হারাতে হয় সেই উদ্দেশ্যে তারা আর সেই বদ্‌-অভ্যাসগুলো তখন ছাড়তে চায় না।'

'কিন্তু ডাক্তারবাবু, এইরকম সব ঘটনা তো কত বাচ্চার জীবনেই ঘটে। তারা তো কই সবাই অমন তোতলামির শিকার হয় না।'

'হ্যাঁ, এ প্রশ্নর উত্তর অবশ্য আগেই বলেছি। তবু আবার একবার বলছি। পারিপার্শ্বিকতার ধাক্কায় অনেক বাচ্চা দৃঢ়চেতা বা দ্বিধাহীন ভাবে বড় হয়ে উঠতে পারে না। তারা কেউ কেউ ভিতু, লাজুক বা অমিশুকে হয়ে পড়ে, যারা তোতলামির শিকার হয়।'

'কিন্তু তোতলামি তাহলে সারতে চায় না কেন ?'

'তোতলামির কারণ খুঁজে বার করে তার যথার্থ ব্যবস্থা নিলে রোগী ঠিকই সারতে পারে। তবে অধিকাংশ সময়েই তা সম্ভব নাও হতে পারে। তারপর আবার তারা শিকার হয় হ্যাংচানি ভ্যাংচানির। যা তাদের মত ভীতু লাজুক ছেলেমেয়েদের করে তোলে আরও দ্বিধাগ্রস্ত এবং ভীতু। যখন তারা নতুন লোক ও পরিবেশের ভয়ে আরও বেশি করে তোতলাতে শুরু করে।'

‘তার মানে তোতলামি দেখলেই বুঝতে হবে তার পেছনে গভীর কোন মানসিক কারণ আছে। তাই না ?’ দেবুমামা প্রশ্ন করলেন।

‘হ্যাঁ, আর যত শীঘ্র সম্ভব তাদের পৌঁছে দিতে হবে কোন মনস্তাত্ত্বিকের কাছে। কারণ তোতলামির কারণ প্রায় সময়েই মানসিক, শারীরিক নয়।’

‘তার মানে, আমরা যে শুনি জিভজোড়া থাকলে কী আলজিভ ছোট থাকলে মানুষ তোতলায় এসবই ভুল ধারণা ?’

‘হ্যাঁ এইসব ভাবা একান্ত ভুল। আজকাল তোতলাদের ভাল করে কথা শেখাবার জন্যে মনস্তাত্ত্বিক ছাড়া, বাক্-চিকিৎসকরাও সাহায্য করেন। প্রয়োজনে মনস্তাত্ত্বিকের চিকিৎসার সাথে সাথে, বাক্-চিকিৎসকদেরও উপদেশ নিতে পারেন। কদাচ, স্নায়বিক কারণেও রোগীর কথাবলার সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেরকম সন্দেহ হলে, মনস্তাত্ত্বিকরাই তাদের স্নায়ু-বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠিয়ে দেন।’

‘যাক্, আজ ডাক্তারবাবুর চেম্বারে বেশি ভিড় না থাকায় আমরা অনেক কিছু শিখতে পারলাম।’ তাপসমেসো উঠে দাঁড়ালেন।

দেবুমামা বললেন, ‘তা বলে, এবার আর দেরি কোর না। উঠে পড়। ডাক্তারবাবুর তো একটু বিশ্রাম দরকার।’

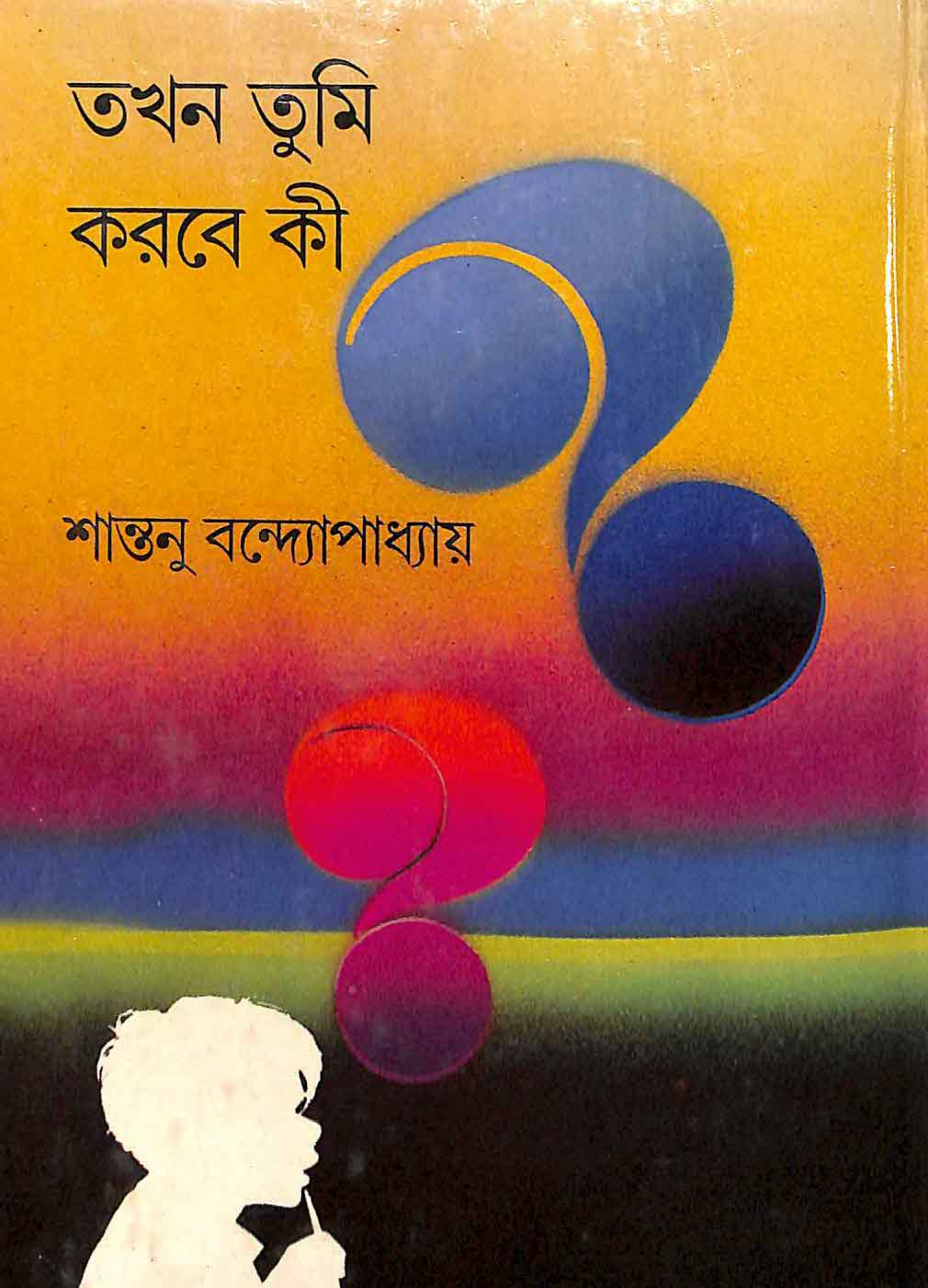
‘কী হল, ওঠ।’ রত্নামাসীকে বসে থাকতে দেখে দেবুমামা হাঁক পাড়লেন।

‘আমি শুধু আর একটা কথা জানতে চাইব।’ রত্নামাসী বললেন।

‘কী কথা ?’

‘পূবালীর আর তোতলা হবার ভয় রইল না তো ?’

‘আরে, এ আর কী কথা ? পূবালী তো সেরে গেছে।’ ডাক্তারবাবু রত্নামাসীর কথা শুনে হো হো ক’রে হেসে উঠলেন।


তখন তুমি
করবে কী
শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়